দোয়েল-সাঁকো

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম আমি। নিচের শহরটা আস্তে-আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে! প্রদীপ দিয়ে সাজানো ঝুলনের মতো লাগছে শহরটাকে। আমি আমার অবসন্ন শরীরটা সিটে টান করে দিলাম। হাত বাড়িয়ে মাথার উপরের আলোটাও নিভিয়ে দিলাম এবার। সামনে লম্বা আর অনিশ্চিত সফর! জানি না শেষ পর্যন্ত কী হবে? আমি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। তারপর ধীরে-ধীরে চোখ বন্ধ হয়ে এল আমার আর দেখলাম, আজ বরফ পড়ছে চারিদিকে। সারা শহরের উপর ভ্যানিলা আইসক্রিমের মতো বরফ জমে আছে। আমি তার উপরেই পায়ের ছাপ দেখলাম। সামনে দিগন্তের দিকে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছে সেই চিহ্ন। আশপাশে কেউ নেই, শুধু আমি একা! আমি জানি ওই পথেই বাবা চলে গিয়েছে। আমায় এখানে রেখে গিয়েছে একা!

ঠাকুরমার গল্প-১

"বহু-বহু বছর আগে ভারতবর্ষের কোনও এক পাহাড়ি অঞ্চলে চিত্রভানু নামে এক রাজা রাজত্ব করত। রাজার জীবনে কোনও কিছুর অভাব ছিল না। তার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, জমু চাষের খেত ভর্তি ফসল, ছ'জন রানি, আঠারোটা ছেলে ছাড়াও আরও কত কী ছিল! তবু রাজার মনে আনন্দ ছিল না একটুও। সারাদিন রাজসভায় বসে রাজকার্য সামলালেও তার মন পড়ে থাকত অন্য কোথাও। গাইয়েরা তাঁকে গান শোনালে তাঁর কানে সুর পৌঁছত না। জাদুকরেরা তাঁকে খেলা দেখালে তাঁর চোখে বিস্ময় ফুটত না। বিদূষক মজার কিস্সা শোনালেও মুখে জাগত না হাসি। শুধু তাঁর মনে হত, 'আমার যদি একটা মেয়ে থাকত!'

"মন্ত্রী দেখল, এমন চললে তো ভারী বিপদ! রাজকার্য তো লাটে উঠবে!

"মন্ত্রী তাই একদিন রাজপুরোহিতের সঙ্গে এই নিয়ে পরামর্শ করল। পুরোহিত বললেন, 'এ তো সোজা ব্যাপার। ওই দূরের বরফ পাহাড়ের গুহায় একটি হলদি গাছ আছে, তার প্রধান মূল নিয়ে এসে যদি বড় রানিকে খাওয়ানো হয়, তবে রাজার মনের ইচ্ছে পূর্ণ হবে।'

"পরের দিন, কাজের ফাঁকে রাজপুরোহিতের এই কথাটি মন্ত্রী রাজার কানে তুলল।

"সব বিস্তারিতভাবে শুনেই রাজা চিত্রভানু যার পর নাই খুশি হয়ে বলল, 'আমি এখুনি যাব সেই হলদি গাছের সন্ধানে!'

"যেই কথা সেই কাজ। সেই দিন বিকেলবেলাতেই রাজা একাই রওনা হল উত্তরের সেই বরফ পাহাড়ের উদ্দেশ্যে।

"পথে নানা বিপদ এল। ভয়ংকর পশু আক্রমণ করল রাজাকে! আকাশ থেকে বজ্রপাত হল রাজার সামনে! ঝঞ্ঝায় দশদিক আঁধার হয়ে এল! তবু রাজা চিত্রভানু বিশ্বাস হারাল না। সব বাধা কাটিয়ে সেই গুহায় গিয়ে ঠিক হলদি গাছটা খুঁজে বের করল সে। তারপর সেটাকে উপড়ে তার প্রধান মূল সংগ্রহ করে ফিরে এল রাজধানীতে।

"সেই প্রধান মূল রাজপুরোহিতের নির্দেশমতো খাওয়ানো হল বড় রানিকে। তারপর যথা সময়ে রানির গর্ভে সন্তান এল।

"আর তার ঠিক নয় মাস পরে পৃথিবীতে এল রাজার স্বপ্ন! তার বড় আদরের কন্যা। রাজা চিত্রভানু তার নাম রাখল, রাজিতা।

"ক্রমশ রাজিতা বড় হতে লাগল। রাজা চিত্রভানুর চোখের মণি সে। কেউ তাকে কোনও কথা বলে না। তার হাজার দোষও ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আঠারোজন দাদা সব সময় বোনের সব আবদার মেনে নেয়। মায়েরা তাকে মাথায় করে রাখে। রাজিতার যেন সুখের শেষ নেই!

"কিন্তু না চাইতেই এত কিছু পেয়ে যাওয়ায় রাজিতা ক্রমশ জেদি হয়ে উঠল! কারও কথাই সে গ্রাহ্য করে না। সকলকেই সে অবহেলা করে।

"এর পর রাজিতা যেই ষোলো বছরে পড়ল, ঠিক তখনই একটা ঘটনা ঘটল। রাজার সৈন্যবাহিনীর একজন তরুণ সৈনিক এক ভোরবেলা রাজিতাকে দেখল রাজপ্রাসাদের উদ্যানে খেলা করতে। দেখামাত্র তার প্রেমে পড়ল সেই তরুণ সৈনিকটি।

"তারপর থেকে সে রোজই নানা সময়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকত উদ্যানের গাছ-গাছালির আড়ালে। ভাবত যদি একটু দেখা পায় রাজিতার!

"এমনভাবে বেশ কিছু দিন কাটে। শেষে একদিন আর নিজেকে আটকাতে পারল না সেই তরুণটি! সব ভিধা আর ভয় দূরে সরিয়ে রেখে সে এসে দাঁড়াল রাজিতার সামনে।

"সরাসরি বলল, 'আমি আপনাকে ভালবাসি রাজকুমারী। জানি আমি সামান্য একজন সৈনিক। সামাজিকভাবে আপনার সমকক্ষ নই। কিন্তু আমি যতটা আপনাকে ভালবাসব ততটা কেউ বাসবে না!'

"সেই কথা শোনামাত্রই রাজকুমারী রাজিতা প্রচণ্ড রেগে গেল। কী! সামান্য একজন সৈনিকের এতটা স্পর্ধা! তাকে ভালবাসার কথা বলে! তার সামনে এসে মুখ তুলে দাঁড়ায়!

"রাজিতা সঙ্গে-সঙ্গে হুকুম করল সেই তরুণ সৈনিকটিকে যেন এখুনি চাবুক মারা হয়।

"রাজকুমারীর নির্দেশ! কে অমান্য করবে? তাই সৈনিকটিকে সেই মুহূর্তেই পাকড়াও করে চাবুক মারা হল।

"সৈনিকটি যখন মার খেয়ে মাটিতে পড়ে আছে, সেই সময় রাজিতা নিজের থেকেই গেল তার কাছে। তারপর অবজ্ঞার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি এখনও ভালবাস আমায়?'

"সৈনিকটি ক্লান্ত কিন্তু নিশ্চিত স্বরে বলল, 'আমি সারাজীবন আপনাকেই ভালবাসব রাজকুমারী, এ জীবন কারও জন্য নয়!'

"এতে রাজিতা আরও রেগে গেল! সে সাস্ত্রিদের নির্দেশ দিল, 'একে সাতদিন অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে রাখো। কোনও খাবার দেবে না। এমনকী, জলও দেবে না।'

"সৈনিকটিকে সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকার কয়েদখানায় ছুড়ে ফেলা হল।

"রাজা চিত্রভানু খুব কড়া হলেও উদার মনের মানুষ ছিলেন। তিনি রাজিতাকে বোঝালেন যে, ভালবাসা তো অন্যায় কিছু নয়। আর তা সব সময় সামাজিক নিয়ম মেনেও হয় না। তাই সৈনিক যুবকটিকে এমন শাস্তি দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। রাজিতার তাকে পছন্দ না হলে সেটা ভালভাবে জানিয়ে দেওয়াটাই প্রকৃত মানুষের মতো কাজ।

"কিন্তু রাজিতা কারও কথাতেই কর্ণপাত করার মেয়ে নয়। রাজার কথাতেও করল না। সাতদিন পরে সৈনিকটিকে অর্ধমৃত অবস্থায় নিয়ে আসা হল রাজিতার সামনে।

"রাজিতা আবার তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি এখনও আমায় ভালবাস?'

"সৈনিকটি ক্ষীণ কিন্তু আত্মবিশ্বাসী গলায় আবারও বলল, 'আমি আজীবন শুধু আপনাকেই ভালবাসব!'

"রাজিতা শুনে থমথমে মুখে তাকিয়ে রইল সৈনিকটির দিকে। রাজা, তাঁর ছয় রানি, আঠারোজন দাদা সকলে শ্রমাণ জ্ঞলল মনে-মনে। না জানি রাজিতা এবার কী করবে!

"রাজিতা সময় নিল কিছুটা। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'ঠিক আছে। আমিও রাজি। তবে একটা শর্ত আছে! আমার ঘরের সামনে যে বাগানটা রয়েছে, তোমায় সেখানে হাঁটু গেড়ে ছ'মাস বসে থাকতে হবে। উঠলে চলবে না। ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। ঝড়, জল, তুষারপাত যাই হোক কোনওমতেই শর্ত ভঙ্গ করা যাবে না। ছ'মাস তুমি যদি এই অবস্থায় কাটাতে পারো, যদি এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারো, তবে আমি কথা দিচ্ছি, তোমায় বিয়ে করব।'

"সৈনিকটি বলল, 'আমি রাজি!'

"এমন একটা খবর তো আর চাপা থাকে না। রাজ্যসুদ্ধ রটে গেল যে, রাজকুমারী রাজিতা সৈনিককে শর্ত দিয়েছে! সকলে ধীরে-ধীরে জড়ো হতে লাগল উদ্যানে আর প্রত্যক্ষ করল সেই অদ্ভুত প্রেমের পরীক্ষা!

"তরুণ সৈনিকটি ঈশ্বরকে প্রণাম করে রাজকুমারীর ঘরের সামনের সেই উদ্যানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

"দিন জড়ো হয়ে সপ্তাহ হল। সপ্তাহ বদলে গেল মাসে। সৈনিকটি বসেই রইল। ক্রমশ শরৎ কেটে হেমন্ত এল। তারপর হেমন্তকে ছিঁড়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল শীতের তেজ। চারদিক তুষারপাতে সাদা হয়ে গেল। রাজিতা হঠাৎ একদিন তার নিজের ঘরের ভিতর থেকে পরদা সরিয়ে দেখল এখনও হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে সেই সৈনিক! তার সারা শরীর তুষার ঢাকা। সে যেন বরফের তৈরি মূর্তি একা। আচমকাই রাজিতার মনটা খারাপ হয়ে গেল। বুকের ভিতর কেমন যেন কষ্টের ছোট-ছোট ফুল ফুটতে শুরু করল। নিজের ঘরের উষ্ণ আরামের ভিতরে শুয়েও সে রাতে ঘুম এল না ওর। শুধু মাঝে-মাঝেই ও উঠে গিয়ে পরদা সরিয়ে দেখতে লাগল সেই বরফ-মোড়া তরুণ সৈনিকটিকে! এমনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ পারে!

"রাজিতা বুঝল ওর মনের পরিবর্তন হয়েছে। আর সৈনিকটির কষ্ট সহ্য করতে পারছে না ও। আর ও চায় না সৈনিকটিকে কষ্ট দিতে। কিন্তু অহং বাধা হয়ে দাঁড়াল এখানে। রাজিতা গুনে দেখল আর তো সাতটা দিন মাত্র বাকি। তারপর যখন সৈনিকটি পরীক্ষায় পাশ করবে, তখন রাজিতা গিয়ে ওকে নিজের আলিঙ্গনের উফতা দেবে। রাজার মেয়ে ও! একবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া কথা তো আর এখন ফেরাতে পারে না! লোকে কী বলবে?

"তারপর ক্রমশ একটা করে দিন কাটতে শুরু করল। রাজিতাও যেন আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। ও নিজেও যেন সেই পরীক্ষা দিচ্ছে এখন। এই ছয় মাসে ওর মনের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন রাজিতাও ভালবেসে ফেলেছে সেই সৈনিকটিকে।

"নির্দিষ্ট দিনের আগের দিন, রাজোর লোক আবারও ভিড় করতে শুরু করল সেই উদ্যানে। রাজা, ছয় রানি এবং সমস্ত রাজপুরুষও এসে দাঁড়াল নিজেদের প্রাসাদের বারান্দায়। রাজিতা, নিজের প্রাসাদ থেকে নেমে এসে দাঁড়াল সেই উদ্যানের মাঝে।

"ঘড়ির কাঁটা ক্রমশ এগোতে লাগল নির্দিষ্ট সময়ের দিকে। সকলে উৎকণ্ঠার সঙ্গে রাজ মিনারের প্রধান ঘড়িটির দিকে তাকাতে লাগল। আর এক ঘণ্টা! আর আধ ঘণ্টা! আর কুড়ি মিনিট! রাজিতা নিজেও অস্থির হয়ে উঠল এবার। কিন্তু কাউকে সেটা ও বুঝতে দিল না! শুধু অপলক চোখে তাকিয়ে রইল তরুণ সৈনিকটির দিকে।

"তারপর যখন ছ'মাস হতে ঠিক দশ মিনিট বাকি তখন হঠাৎই চোখ খুলল সেই সৈনিক। তারপর সকলকে অবাক করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল!

"ভিড় করে দাঁড়ানো রাজোর প্রজারা হায়-হায় করে উঠল। আর তো মোটে দশটা মিনিট ছিল ছ'মাস পূর্ণ হতে! যুবকটি কি সেটা বুঝতে ভুল করল! নানা দিক থেকে লোকজন চিৎকার করে তাকে বলতে লাগল, 'আর কম মিনিট বাকি! মোটে দশটা মিনিট বাকি! তুমি এত মাস বসে রইল পাথরের মূর্তির মতো আর দশটা মিনিট বসবে না!'

"রাজিতা নিজেও স্থির হয়ে গিয়েছে। বুকের ভিতরে ওর কাঁপুনি আর বিস্ময়ের দোলাচল! কী করছে সৈনিকটি! এত কাছে এসেও এমন কেন করছে ও? ছ'মাস অমানুষিক কষ্ট সহ্য করেও ওমন কেন ও নিজেকে এমন করে সরিয়ে নিচ্ছে পরীক্ষা থেকে! কেন ইচ্ছে করে অকৃতকার্য হচ্ছে?

"সৈনিক উঠে দাঁড়িয়ে সটান চোখে-চোখ রাখল রাজিতার। এক অদ্ভুত মেঘ-আলোর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত! তারপর আর কাউকে কিছু না বলে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল!"

ঠাকুরমা কথা থামিয়ে পানের বাটা টেনে নিল কোলে। রাজিতা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। বলল "ঠাকুরমা, এটা কী হল? এ কেমন গল্প!"

"কেন?" ঠাকুরমা পান সেজে মুখে দিয়ে বলল, "কেমন আবার! যেমন গল্প তেমনই বললাম!"

রাজিতা বলল, "আমার নামে রাজকুমারীর নাম!"

ঠাকুরমা হেসে বলল, "বাঃ এমনও তো হতে পারে যে, ওই রাজকুমারীর নামে তোর নাম!"

রাজিতা ভুরু কুঁচকে বলল, "তা না হয় হল, কিন্তু গল্পের শেষে কী হল? সৈনিকটার নাম কী? সে কেন উঠে চলে গেল? আর রাজকুমারী? সেও এমন কেন? গল্পের এমন শেষ হয় নাকি?"

ঠাকুরমা বলল, "এমন শেষ মানে!"

রাজিতা বলল, "এর পর কী হবে বললে না তো?"

ঠাকুরমা সময় নিল একটু। জড়ো করা পা দুটো টান করে বলল, "এর পর কী হবে আমি জানি না।"

"জান না মানে!" রাজিতার রাগ হল। এ আবার কেমন ধারার গল্প!

ঠাকুরমা ক্লান্ত মুখটা তুলে তাকাল রাজিতার দিকে। তারপর বলল, "সব শেষটা তো বলা থাকে না দিদিভাই! নিজের মতো করে শেষটাকে খুঁজে নিতে হয় আমাদের! কে, কেন, কী করে, জীবনে সব উত্তর কি একবারে পাওয়া যায়! তোকে তোর মতো করে এই গল্পের উত্তর খুঁজে নিতে হবে! বুঝলি?"

এক

রাজিতা

আলো অন্ধকারে মেশানো একটা সকাল আজ। তেজা হাওয়ায় কেমন যেন মন খারাপ করা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে! চোয়ান শক্ত করে দৌড়নো এই শহরের চোখেও আজ যেন আনমনাভাব। একলা চড়াই হয়ে সকলে যেন বসে আছে নির্জন বারান্দায় আর আমায় বলছে, ও নেই! বলছে, এ জীবনের মতো ও চলে গিয়েছে আমায় ছেড়ে!

আমি ওড়না দিয়ে মুখটা মুছলাম। মেঘ করে থাকায় সারা রাতভরা জুড়ে আজ কেমন একটা কম্বলচাপা গরম। ছোট গলিটা থেকে বড় রাস্তায় বেরিয়ে দাঁড়ালাম একটু। মনখারাপের মাঝেও হঠাৎ হাসি পেল! কোন দিন ও আমার ছিল? জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তো ওকে দেখছি! কিন্তু তাও কোনও দিনও কি আমার ছিল ও?

আমি রাস্তার দিকে তাকালাম। সকাল ন'টার কলেজ স্ট্রিট মোড় যেন গিঁট লাগা সুতো!

আমি দেখেশুনে রাস্তা পার হলাম। তারপর সোজা আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে থাকলাম। দোকানপত্তর খোলেনি। তাই ফুটপাথে পা রাখা যাচ্ছে এখনও।

আমার বাড়ি বেনিয়াটোলা লেনের ভিতরের এক গলিতে! বাড়িটা পুরনো! বয়স দু'শো বছরের বেশি। প্লাস্টার খসে গিয়েছে ভারত স্বাধীন হওয়ার আগেই। শুধু পাতলা ইট আর চুন-সুড়কির গাঁথনি দেখা যায় এখন। কেমন যেন সাতের দশকের বাংলা আর্টফিল্মের মতো লাগে বাড়িটাকে! তবে বাড়িটার একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে! তিনতলা থেকে একটা লোহার ব্রিজ চলে গিয়েছে রাস্তার ওপাশের আরও-একটা বাড়িতে! মাটিতে দাঁড়ালে অদ্ভুত দেখতে লাগে! দুটো বাড়িকে যুক্ত রেখেছে একটা ব্রিজ! পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট ব্রিজ কি এটাই?

ব্রিজের অন্য মাথার বাড়িটা আমাদেরই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের! মানে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহের জেঠতুতো দাদাদের! সহজ করে এই সম্পর্ককে কী বলে আমি জানি না।

আমার আর ভাইয়ের ঘর তিনতলায়! আমার ঘরের সামনের ছোট্ট ঝুলবারান্দাটা থেকেই ওই ব্রিজটা শুরু হয়েছে।

ওই ব্রিজটাকে প্রায় সকলে সাঁকো বলে। তবে প্রায়! সকলে নয়। কারণ আমি শুধু সাঁকো বলি না। বলি দোয়েল-সাঁকো!

আগে সাঁকোটা ভাল ছিল। কিন্তু ভাগের মা তো, তাই গঙ্গাটা জোটেনি। ফলে রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি একটুও। এখন সাঁকোর মেঝেটা জায়গায়-জায়গায় কেমন যেন ভেঙে গিয়েছে। শুধু সাপোর্ট রাখা বড় লোহার বিম দুটো দেখা যায়। আমরা কেউ আর ওতে পা দিই না। ভয় লাগে, শরীরের ভারে যদি মড়মড় করে ভেঙে পড়ে!

বড় রাস্তা থেকে কোনা ধরে ঢুকে গিয়েছে বেনিয়াটোলা লেন। সেখান দিয়ে কিছুটা এগিয়ে ডান দিকের গলিটায় আমাদের বাড়ি। রোদ উঠলেও এই গলিটা ছায়া-ছায়া হয়ে থাকে সবসময়। আর আজ আবার এমন মেঘলা। তাই এই মধ্য আগস্টে কেমন যেন স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে রাস্তাটা।

আমার আজ একটু দেরি হয়ে গিয়েছে। আসলে সপ্তাহে তিনদিন হাবিবুরদার বাড়িতে আমি পড়াতে যাই। সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে আটটা। দু'ঘণ্টা। ইংরিশ আর ইতিহাস পড়াই হাবিবুরদার ছাই লিটনকে।

লিটন এবার মাধ্যমিক দেবে। ওর স্কুল সাড়ে ন'টা থেকে। তাই ওকে সপ্তাহে তিনদিন এমন ভোরবেলা পড়াতে যেতে হয়।

আজ আমার সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল একটু। তাই সাড়ে ছ'টার জায়গায় পৌঁনে সাতটা হয়ে গিয়েছে লিটনকে পড়াতে যেতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে বেরোতেও দেরি হয়েছে।

না, আমার তেমন কোনও রাজকার্য নেই। আসলে বাবা কারখানায় যাওয়ার জন্য বেরোয় সাড়ে ন'টা নাগাদ। যাওয়ার আগে আমায় একবার দেখতে চায়। বাবা লিলুয়ার কাছে একটা পোলট্রি মিলে চাকরি করে, ফোরম্যান। সকাল সাড়ে ন'টায় বেরিয়ে ফিরতে-ফিরতে সন্ধে সাড়ে সাতটা হয়ে যায়। বাবাকে দেখলেই বোঝা যায় খাটনি যায় মানুষটার। সন্ধেবেলা যখন ফেরে মুখ শুকিয়ে যায়। মনে হয়, কে যেন সমস্ত প্রাণটাই শুষে বের করে নিয়েছে!

আমাদের বাড়িটা বেশ কিছু শরিকে ভাগ করা আছে। আমাদের দিকে আমরা আর জেঠ্রতা খাকি। বাবারা তিন ভাই। জেঠু বড় আর বাবা মেজ। ছোট ভাই মানে তরুণ কাকা গত দু'বছর আগে লাং ক্যানসারে মারা গিয়েছেন। তরুণ কাকা বিয়ে করেনি। ফলে বাবা আর জেঠু দু'জনের ভাগে পড়েছে বাড়ির এই পূর্ব দিকটা। অন্য পাশে বাবার খুড়তুতো ভাইরা থাকে। তারা আমাদের সঙ্গে খুব একটা কথা বলে না। না, কোনও ঝগড়াঝাঁটি নেই। কিন্তু তাও আমরা দু'পক্ষই দু'পক্ষকে এড়িয়ে যাই।

আমার মা বাড়িতেই থাকে। ছা-পোষা গৃহবধূ যাকে বলে। কোনওদিনও চাকরি-বাকরি করেনি। সেই যে উনিশ বছর বয়সে এই বাড়ির বউ হয়ে ঢুকেছিল এখনও তেমনই রয়ে গিয়েছে। বাবা, আমি আর ভাই-ই মায়ের বিশ্বসংসার।

মায়ের শরীরটা ভাল যায় না। ডায়বেটিস, হাঁটুর ব্যথা, হার্টের অসুখ সব আছে। মাসে হাজার দু'য়েক টাকার ওষুধ লাগে। আমাদের সংসারে পক্ষে সেটা অনেক ভারী। বাবা পায় হাজার পনেরো টাকা। আমি টিউশন করে মোট পাই সাড়ে চার হাজার। সেখান থেকে তিন দিয়ে দিই বাড়িতে। দেড় রাখি হাতখরচ হিসেবে।

আমি জানি আমার বন্ধুরা যেমন জীবনযাপন করে, আমার জীবন তেমন নয়। ছোট থেকেই জেনে এসেছি টানাটানির সংসার। শিখেছি কী করে টিপে-টিপে ইচ্ছেগুলোকে মেরে ফেলতে হয়। বছরে একবার বিরিয়ানি খেয়ে খুশি থেকেছি। সকলে যখন পাঁচ-ছ'জন টিচারের কাছে টিউশন নিয়েছে, আমি তখন একজনের কাছে পড়ে বাকিটা এর ওর থেকে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। 'মাসের শেষ' নামে একটা সময় মাসের প্রথম থেকেই আমাদের তাড়া করে এসেছে!

তাই ইকনমিক্স অনার্স নিয়ে পড়া শেষ করেই আমি চাকরির জন্য চেষ্টা শুরু করে দিয়েছিলাম। মাস্টার ডিগ্রি করিনি। অবশ্য সত্যি কথা বলতে কী রেজাল্টও ভাল হয়নি খুব একটা। তাই সুযোগও পাইনি শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার।

বাবার কষ্ট হয়েছিল খুব। বাবা চেয়েছিল আমি এমএসসি-টা করি। কলকাতায় না থেকে বাইরের কোনও জায়গা থেকেও যদি করতে পারি! কিন্তু আমিই বাধা দিয়েছি। আরও একটা জায়গায় গিয়ে থাকা মানে আরও একটা বাড়তি সংসার। পড়ার খরচ তো আছেই। সঙ্গে থাকা-খাওয়ার খরচ! আমি জানি সেটা আমাদের পক্ষে মোটানো সম্ভব নয়।

আর আমি একটা চাকরি পেয়েও গিয়েছিলাম। কিন্তু কপালে টেকেনি! চিট ফান্ডের কেলেঙ্কারিতে পড়ে আমাদের কোম্পানিটা উঠে গিয়েছে। তারপর থেকে আমি বেকার। অনেক জায়গায় আমি রেজিউমে দিয়ে রেখেছি, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। পাশাপাশি গানের জগতেও চেষ্টা করছি। কিন্তু সেখানেও কিছু হচ্ছে না।

ক্লাস টু থেকে গান শিখি আমি। পাড়ার জলসা থেকে দূরদর্শন সব জায়গাতেই গান করেছি। কিন্তু সেটুকুই। কতদিন ধরে চেষ্টা করছি একটা সিডি বের করার। কিন্তু কেউ সুযোগই দিচ্ছে না!

আচ্ছা, সব কিছুই খুব 'না', 'না' শোনাচ্ছে, তাই না? আসলে কী করব? একটা নেগেটিভলি বায়াসড জীবনে আটকে আছি যেন। কোন বিউটেস পসথুয়াস এফাক্সসটেন্স-এ আমাদের দিন আর রাত্রিগুলো সব মুড়ে আছে।

আমাদের দু'শো বছরের পুরনো বাড়ি, আমাদের সপ্তাহে দু'দিন ছোট মাছের ঝোল, বিছানায় শুয়ে দেখা কড়িবরগার পাশে বেরিয়ে পড়া বাড়ির লোহার পাঁজর আর শেষ রাতের আচমকা হাওয়ায় ভেসে আসা ছাতিম ফুলের গন্ধ কেমন যেন এলোমেলো করে দেয় আমায়। মনে হয় বাড়ির দেওয়ালগুলো যেন চারিদিক থেকে চেপে ধরছে। যেন টুথপেস্টের টিউবের মতো আমার পেট টিপে বের করতে চাইছে, ভাল চাকরি, অনেক রোজগার, সাফল্য আর সুন্দর একটা ভবিষ্যতের রোড ম্যাপ। এই চব্বিশ বছর বয়সেই মনে হয় বছর চল্লিশেরে একটা পৃথিবী ঢুকে পড়েছে আমার মধ্যে!

বাড়ির সামনে এসে মোবাইলটা দেখলাম। এটা নতুন। জেঠু কিনে দিয়েছে। সাড়ে সাত হাজার টাকা দাম। আমার কাছে অনেক! খুব ভয় লাগে ব্যবহার করতে। একবার যদি হারিয়ে ফেলি তবে তো আর কিনতে পারব না!

আরে ফোন এসেছিল একটা! শুনতে পাইনি। আসলে পড়াতে বসলে মোবাইলটা সাইলেন্ট করে রাখি। পড়ানো হয়ে গেলে আবার রিঙ্গারটা অন করে দিই। কিন্তু আজ সবটাই যেন কেমন গুলিয়ে গিয়েছে। হবেই! কারণ, গতকাল তো ও চলে গিয়েছে। আর আমার মন বলছে সারা জীবনের মতোই ও সরে গিয়েছে আমার থেকে।

মিসকলটা দেখে আবার এই কথাটা মনে পড়ল। কাকিমা ফোন করেছিল। কেন করেছিল জানি না। আমি ভাবলাম কল করি। তারপরেই মনে পড়ল আমার মোবাইলে ব্যালেন্স নেই তেমন। আর কাউকে মিসকল দিতে আমার খারাপ লাগে। জানি কাকিমা এসবে কিছু মনে করবে না। কিন্তু কেউ কিছু মনে করবে না বলেই তো আর আমি তার অন্যায় সুযোগ নিতে পারি না!

নকশা করা মোটা কাঠের সদর দরজাটা ঠেলে আমি বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। আমাদের একতলায় সিঁড়ির এক পাশে শ্যাওলা ধরে গিয়েছে। আমি সাবধানে পা ফেলে তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম জেঠিমা বারান্দায় বসে তরকারি কাটছে। আমায় দেখে জেঠিমা গলা তুলে বলল, "তুই কি আজ বেরবি রাত্তিরে?"

আমি দাঁড়ালাম। বললাম, "হ্যাঁ, একবার পার্ক স্ট্রিট যাব। কেন বোল?"

জেঠিমা বলল, "আমায় একটা শেকড় এনে দিবি? জ্যোতিষ ভটচাজ বলেছেন পরতে। শ্বেত বেড়েলার মূল পরলে নাকি হাঁটুর ব্যথা কমবে।"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এই হচ্ছে জেঠিমার এক সমস্যা! সারাদিন জ্যোতিষ-টোতিষ হাবিজাবি নিয়ে পড়ে আছে। আমি জানি, বলে কোনও লাভ হবে না। তাই বলি না। কারণ, জেঠিমা কারও কথা শোনার পাত্রী নয়। উলটে আমাদের সকলকে জেঠিমার কথা শুনতে হয়!

বললাম, "এনে দেব!"

জেঠিমা বলল, "দুটো আনবি। একটা আমার আর-একটা মিঠির!"

"মা পরবে!" আমি অবাক হলাম। মা আবার এসব কবে থেকে ধরল?

"কেন পরবে না?" জেঠিমা ভুরু কোঁচকাল, "তোর মায়ের হাঁটুর কী অবস্থা জানিস? কত কষ্ট পায় দেখিস না? তবে?"

আমি বললাম, "সে তো কার্টিলেজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শেকড় পরলে সেটা গজাবে নাকি আবার?"

"তোকে যা বললাম শোন। এনে দিবি শেকড়। দুটো দশ টাকা নেবে। আমার থেকে নিয়ে যাবি। কোনও তর্ক করবি না। বুঝেছিস?"

আমি হাসলাম। জেঠিমা এমনই। কখনও পালটা কথা শুনতে চায় না। বেঁচে থাকার জন্য, জেঠিমার নিজস্ব কিছু যুক্তি আর পদ্ধতি আছে। কেউ তাকে সেখান থেকে সরাতে পারে না। যা ভাববে তা করবেই!

জেঠিমা বলল, "তুই এখনও হাসছিস কেন? আমি কি ভুল বললাম?"

আমি বললাম, "কিছুই ভুল বলোনি। আসলে তোমার কমডিকশন দেখে হেসে ফেলছি!"

"কী?" জেঠিমা বলল, "খুব ইংরেজি শিখেছিস, না? যা বললাম শুনবি!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেঠিমা আবার তরকারি কাটায় মন দিল।

জেঠু পুলিশ ছিল। এখন রিটায়ার করেছে। তাও রোজ সকাল-সকাল বেরিয়ে যায়। আসলে নিজেই একটা বেডিংয়ের ব্যবসা শুরু করেছে বি.বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে। জেঠু-জেঠিমার এক মেয়ে। জুনিদিদি। বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এখন নাসিকে থাকে।

আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। নিচের তলার গোটাটা আর দোতলার অর্ধেক জেঠুদের। আর দোতলার বাকি অর্ধেকের সঙ্গে তিনতলাটা আমাদের। বাবা-মা থাকে দোতলায়। আমি আর ভাই তিনতলায়।

দোতলার রান্নাঘর থেকে শব্দ শুনে বুঝলাম মা কাজ করছে। স্বাভাবিক। বাবার কারখানা যাওয়ার সময় হল। বাবা ভাত খাবে তো।

আমি বাবার ঘরে গিয়ে উঁকি দিলাম। বাবা স্নান সেরে জামাকাপড় পরে তৈরি। বিছানায় বসে খবরের কাগজ দেখছিল। আমায় দেখে মুখ তুলে তাকাল, "আরে তুই এসেছিস। বউদি ফোন করেছিল। তোকে পায়নি ফোনে। রিং হয়ে যাচ্ছিল, তুলিসনি নাকি?"

আমি ঘরে ঢুকে ফ্যানটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "সাইলেন্ট ছিল শুনতে পাইনি। কী হয়েছে?"

"বল তো রিয়ান রাতে চলে গেল। তাই পুজো দিতে আসবে ফিরিঙ্গি কালীবাড়িতে। মানত ছিল বউদির। তোকে নিয়ে যেতে চায়।"

"আমায় নিয়ে!" অবাক লাগল আমার। গতকালও তো বিকেল অবধি ছিলাম ওখানে। কিছু তো বলেনি কাকিমা। অবশ্য আমিই বা শোনার মতো অবস্থায় ছিলাম কই!

"তাই তো বলল আমায়। বলল তুই যেন হুট করে বেরিয়ে না যাস," বাবা হাসল, "আর শোন না, তোর নাকি টাকার দরকার! কী ব্যাঙ্কিং পরীক্ষার ফর্ম ফিল-আপ করবি শুনলাম।"

আমি অবাক হলাম। আমি তো মা-বাবাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলিনি। তবে কে বলল?

বাবা যেন বুঝতে পারল। বলল, "জুডো বলল সকালে। এই টেব্‌লের ড্রয়ারটা খোল। ওতে যে ব্রাউন খামটা রয়েছে তার থেকে দরকার মতো টাকা নিয়ে নে।"

জুডো আমার ভাই। খুব পেটপাতলা।

আমি ঠোঁট টিপে তাকালাম বাবার দিকে। মাসের বারো তারিখ আজ। এখনই চারশো টাকা বের করে নিলে মাসের শেষে মুশকিল হবে।

বাবা আবারও বুঝতে পারল, হেসে বলল, "আরে গত মাসে বেশ কিছু ওভারটাইম হয়েছে। তুই ভাবিস না। ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলে এই এক মুশকিল, বাবা-মায়ের সব কথাতেই প্রশ্ন করতে শুরু করে। যা বলছি শোন। নে।"

আমি হেসে বললাম, "ঠিক আছে, পরে নেব।"

"কী পরে নিবি?" পিছন থেকে মায়ের গলার স্বর পেলাম।

দেখলাম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচলে হাত মুছছে মা। চোখে জিজ্ঞাসা।

বাবা বলল, "ওই ফর্মের টাকা।"

মা কী বুঝল কে জানে! তবে আর কথা বাড়াল না। বলল, "তুমি খেতে এসো। ভাত দিয়ে দিয়েছি।"

বাবা বলল, "তুমি যাও আমি আসছি।"

মা বেরিয়ে গেল আবার।

বাবা খবরের কাগজটা রোল করল। তারপর বিছানা থেকে উঠে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। কাগজ দিয়ে আলতো করে আমার মাথায় মেরে বলল, "মনখারাপ?"

"কেন?" আমি অবাক হলাম।

বাবা হাসল, "তুই জানিস না?"

আমি দীর্ঘশ্বাসটা দ্রুত গুমখুন করে দিলাম। তারপর পালটা হেসে বললাম, "না তো!"

বাবা তাকাল আমার দিকে। তারপর বলল, "কিছুই কিছু নয়, বুঝলি! সবাই মায়া-খনিজ! সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পড়িস তো! এটা জানিস না?"

আমি বললাম, "ওপরে যাই, একটু ফ্রেশ হয়ে নিই, কাকিমা এলে হইচই শুরু করে দেবে। তখন সময় পাব না।"

বাবা বলল, "আয়। টাকাটা নিয়ে নিস। আর শোন, যে-ব্যাপারে আমাদের হাত নেই সেই ব্যাপারে মনখারাপ করে লাভ হয় না। জানি তোর বয়স কম। এসব এখন মানতে পারবি না। কিন্তু চেষ্টা কর। একসময় ঠিক পারবি! একদিনে কেউ পারে না।"

তিনতলায় আমার ঘরে এসে কাঁধের ব্যাগটাকে রাখলাম টেব্‌লে। তারপর বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। এখানে, কোনায় একটা ছোট বেসিন রাখা আছে। মুখ ধুয়ে দাঁড়িতে টাঙানো গামছায় মুখটা মুছে তাকালাম পাশের বাড়ির দিকে। সাঁকোর ওই দিকে বারান্দায় একটা কাঠের চেয়ারে বসে রয়েছে ঠাকুরমা। পাশের অন্য একটা বাড়ির কার্নিসে এসে বসা সার-সার পায়রার দিকে চোখ।

ঠাকুরমাকে দেখলেই ভাল লাগে আমার। এককালে খুব সুন্দরী ছিল বোঝা যায়। এখনও তার টুকরো-টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে উপস্থিতিতে। একটা ঢিলে নাইটি পরে বসে রয়েছে ঠাকুরমা। মাথায় ছোট করে কাটা সাদা চুল। প্রায় চুরাশি বছর বয়স, তাও এখনও নিজেই টুকটুক করে সব কাজ করে। ছোটবেলায় কত গল্প শুনেছি ঠাকুরমার কাছে। এখনও কিছু-কিছু মনে আছে।

আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় হলেও ঠাকুরমার সঙ্গে আমার ছোট থেকেই খুব ভাব। এখনও যাই মাঝে-মাঝে। কুকি বলে একটা মেয়ে আছে ঠাকুমার সব কাজ করে দেওয়ার জন্য। তেমন দরকার পড়লে কুকিকে দিয়ে ঠাকুরমা আমায় ডেকে পাঠায়।

আমি দেখলাম ঠাকুরমা খুব মন দিয়ে পায়রাদের দেখছে। আমি জানি ঠাকুরমা কানে কম শোনে। তাই এখান থেকে ডেকে লাভ হবে না।

"কী রে? রেডি হোসনি?"

আচমকা পিছন থেকে গলাটা শুনলাম। সামান্য চমকে উঠলাম। ঘুরে দেখলাম কাকিমা!

"তুমি!"

"কেন রজত বলেনি আমি আসব?"

"হ্যাঁ, বাবা বলেছিল তো," আমি হাসলাম, "আসলে পড়িয়ে এই ফিরলাম। ভেবেছিলাম তোমার আসতে আরও একটু সময় লাগবে।"

কাকিমা বলল, "আমি ট্যাক্সিতে আসতে-আসতেই ফোন করে দিয়েছিলাম। তা জুডো কই রে?"

আমি হাসলাম, "ও ঘুমোচ্ছে! জানই তো সারারাত জাগে!"

আমার পাশের ঘরে ভাই থাকে। ঘরের দরজা বন্ধ।

কাকিমা হাঁপিয়ে গিয়েছে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বলল, "তোদের এই তিনতলাটা এখনকার বাড়ির পাঁচতলার সমান। উঠতে গেলে চারটে ফুসফুস লাগে!"

আমি বললাম, "তুমি আমার ঘরে বসো। আমি চেঞ্জ করে নিই।"

"না, চেঞ্জ করলে হবে না," কাকিমা বলল, "স্নান করে আয়। পুজো দিতে যাব। এভাবে হয়? আর এই শাড়িটা পরে নে। নতুন। তোর জন্যই কিনেছি।"

"শাড়ি!" আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

কাকিমা বলল, "নতুন শাড়ি পরেই পুজো দিতে যেতে হয়। আমি ফলস পিকো সব করিয়ে রেখেছি।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

কাকিমা ধমক দিল, "কী হল? নে।"

আমি যন্ত্রের মতো শাড়িটা নিলাম। কাকিমা কিছু বললে 'না' করার মতো সাহস আমার নেই।

"যা স্নানটা সেরে আয়। এমনিতে দেরি হয়ে গিয়েছে।"

আমি পিছন ঘুরলাম যাব বলে। কিন্তু তখনই কাকিমা ডাকল আবার, "শোন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তাকালাম, "কী?"

"এইটে তুই ফেলে এসেছিলি গতকাল," কাকিমা হাত বাড়িয়ে একটা ছোট বই দিল।

আমার বুকটা হঠাৎ ধক করে উঠল। এটা গতকাল রিয়ানকে দিয়েছিলাম আমি। উপহার। পার্টিং গিফ্ট। অক্সফোর্ডের মিনি ডিক্শনারি। ছোট থেকেই ও সব সময় এই মিনি ডিক্শনারিটা নিয়ে ঘোরে। হারিয়ে ফেলেছিল নিজেটা। তাই ভেবে যাওয়ার আগে ওকে এটা কিনে দিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল আমার একটা টুকরো অন্তত সারাক্ষণ থাকবে ওর সঙ্গে! আর ও এটা নিয়েই যায়নি! আচ্ছা, ওই ব্যাপারটার জন্য কি?

"কী হল? ধর।"

আমি নিলাম ছোট্ট বইটা। আর ঠিক তখনই ওই পাশের বাড়ির কার্নিসে বসা সার-সার পায়রাগুলো ডেকে উঠল এক সঙ্গে। হাওয়ার ভিতর মনখারাপের গন্ধটা ফিরে এল আচমকাই। আলো ও অন্ধকার ঠাসাঠাসি করে ঢুকে পড়ল সকালবেলার মধ্যে। আর আবার সকলে যেন একসঙ্গে বলে উঠল, ও নেই। বলে উঠল, সারাজীবনের মতো ও আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছে!

দুই

রিয়ান

ইমিগ্রেশন পার করে প্রথম বিদেশের মাটিতে পা দিয়েই হাত-ঘড়িতে চোখ রাখলাম আমি। সকাল দশটা কুড়ি বাজে। সময়টা জানা খুব দরকার আমার। কারণ এই দিন আর এই সময়টা আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। আজ থেকে আমার বেঁচে থাকার একটা নতুন পথ খুলে গেল।

আমি ভাল করে চারিদিকে তাকালাম। ঝকঝক করছে সবটা। কত রকমের মানুষ হাঁটছে, দৌড়চ্ছে। কিন্তু তার ভিতরেও কোথাও কোনও হামলে পড়া ব্যাপার নেই। অন্যকে গুঁতো মেরে এগোনোর চেষ্টা নেই। আমি এদিক-ওদিক খুঁজলাম। সামুদার আসার কথা। কিন্তু কোথাও তার টিকির দেখা পেলাম না। এবার তবে কী হবে?

নিমেষের মধ্যে আমার মুখতা ন্যাঁতানিসে বদলে গেল। হাতের বড় দুটো সুটকেস টানতে-টানতে আমি একটা বসার জায়গার সামনে দাঁড়ালাম। সামুদার মনে আছে তো যে আমি আসছি!

গতকালও তো দুবাই থেকে ফোন করে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম। সামুদাও বলেছিল বশটার মধ্যে পৌঁছে যাবে এয়ারপোর্টে। তবে কোথায় সামুদা? ভুলে গেল নাকি! আমি তা হলে যাব কী করে? সামুদাই বলেছিল আমার জন্য অ্যাপার্টমেন্ট ঠিক করে রেখেছে। নিজেই নিয়ে যাবে। তার কোনও ঠিকানাও আমাকে দেয়নি। চাইলে বলেছিল, "মারব শালা কানের গোড়ায়। আমি তবুও বিশ্বাস হচ্ছে না, না?"

আসলে সত্যি বিশ্বাস হচ্ছে না। কারণ সামুদার খুব ভুলো মন!

সামুদা মানে শ্যামল চক্রবর্তীকে আমি চিনি ছোটবেলা থেকে। ভবানীপুরে চলে যাওয়ার আগে মুরিয়ালির কাছে রজনী সেন রোডে থাকতাম আমরা। সামুদারা থাকত আমাদের দুটো বাড়ি পরে। আমার থেকে প্রায় দশ বছরের বড় সামুদা। কিন্তু মেশে বন্ধুর মতো। সামুদা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ভাল ফুটবল খেলত। হলিউডের ছবি বলতে পাগল। আমার ছোটবেলার আইডল!

সামুদাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল। বিশাল বড় পরিবার। সামুদার ভাষায় রাবণের গুষ্টি!

সামুদা বলত, "শালা এই এত বড় ফ্যামিলিতে জন্মানোর যে কী জ্বালা! তিনটে পায়খানা। তাও সব সময় তিনটেই অকুপায়েড। পটি চাপলে রীতিমতো ধুপকাঠি বিক্রি করার মতো করে পায়খানার ভিতরের জন্যকে কনভিন্স করতে হয়। তারও উপর খাবার জায়গায় ভাগ পাওয়া! যেদিন প্রথম সুযোগ পাব সেদিনই কেটে পড়ব আমেরিকা। আরে সালমা হায়েক, ব্রিউ ব্যারিমোর সব ওয়েট করছে আমার জন্য! এই দেশে আমার মতো প্রতিভার কোনও দাম নেই, বুঝলি!"

সেই সামুদা এখন ডালাসে থাকে। গত ছ'বছর আছে। তাই এখানে পড়তে আসার সময় প্রথমেই সামুদার কথা মনে পড়েছিল।

এসএমইউ, মানে সাউদার্ন মেথডিস্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসছি শুনে সামুদাও খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, "চলে আয় তাড়াতাড়ি। কোনও অসুবিধে হবে না। ব্যাপক লাগবে দেখবি আর আমি তো আছি।"

সামুদা আছে, এই ডালাসেরই কোথাও আছে সামুদা। কিন্তু কোথায়? সেটাই প্রশ্ন!

ঘড়ির কাঁটা প্রায় এগারোটা ছুঁতে যাবে। আমার এবার রীতিমতো ভয় লাগছে। এমন বিশাল দুটো সুটকেস আর দরকারি কাগজের সাইডব্যাগটা নিয়ে কোথায় দৌড়াদৌড়ি করব?

আমি আশপাশে তাকালাম। শুনেছি আমেরিকায় প্রচুর ভারতীয় আছে। বাঙালিও নাকি অনেক। কিন্তু এই বিপদের সময় একজনকেও চোখে দেখলাম না।

আমার খুব ভুল হয়ে গিয়েছে যে, আমি মোবাইল নিয়ে আসিনি। আসলে ইন্টারন্যাশনাল রোমিংয়ে প্রচুর খরচা। অতটা আমার সাধ্যের বাইরে। তা ছাড়া নেমেই তো সামুদাকে দেখার কথা। কী করে বুঝব যে, ছ'বছরেও সামুদার লেট করার বাতিক লেল না! আর শুধু লেট করলে তো কথাই ছিল না, সামুদার মনটাও যে খুব ভুলো। নিজেই বলত, "শালা কোনদিন না শ্বাস নিতে ভুলে যাই! তা হলেই কেলো!"

'কেলো' কে আমি জানি না। কিন্তু বাঙালিকে নানা দুর্দশায় ফেলতে এই লোকটির জুড়ি নেই! এই এখন যেমন আমায় ফেলেছে!

আমি ভাবলাম, কী করা যায়। এখানে কি কোনও ফোন বুথ নেই? আমি আশপাশে চোখ বোলালাম। না নেই! তবে যে হলিউড সিনেমায় দেখায় রাস্তার ফোন বুথ আছে! কী বিপদ রে ভাই! তারপরেই মনে পড়ল সামুদা বলেছিল, "হলিউড দেখে এখানে এলে কিন্তু কেস খাবি! জানবি ওটা সিনেমা আর এটা সত্যিকারের জীবন!"

আমি মনে-মনে ভাবলাম আশপাশে দেখে তো সকলকেই ভদ্রলোক মনে হচ্ছে। একটা কাজ করি। লাগেজটা এখানেই রেখে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি। এখানে না থাকলেও সামনে নিশ্চয়ই কিছু একটা পেয়ে যাব।

আমি লাগেজটা রেখে সামনে এগিয়ে গেলাম। এত বড় এয়ারপোর্ট। কত রকম সাইন ঝুলছে। আমি বুঝতেই পারছি না কী করব। শ্বশ মিনিট উন্মাদের মতো এদিক-ওদিক ঘুরে আবার ফিরে এলাম আমার জায়গায়। বুকের ভিতর রীতিমতো ধাপাধপি চলছে। কী করব এখন? সামুদাকে ফোন করাটা জরুরি!

আমি বসার জায়গার কাছে ফিরে এসে একটু হকচকিয়ে গেলাম। প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গায়ে সিকিউরিটির পোশাক। আমায় দেখেই ভুরু কুঁচকে খটমট উচ্চারণে কিছু একটা জিজ্ঞেস করলেন।

আমি ঘাবড়ে গেলাম। আগাগোড়া ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছি আমি। কিন্তু তাও এদের উচ্চারণ ভঙ্গির জন্য ইংরেজিকেও গ্রুটের ভাষা মনে হচ্ছে।

আমি "সরি?" বলে আবার বুঝতে চাইলাম কী বলতে চাইছে মানুষটা!

মানুষটি বললেন, "এটা কি তোমার লাগেজ? এমন আন-অ্যাটেন্ডেড রেখে দিয়েছ কেন?"

আমি বললাম, "খুব বিপদে পড়েছি। আমি এসএমইউ-তে সুযোগ পেয়ে পড়তে এসেছি। এটা আমার প্রথমবার। কিন্তু যে নিতে আসবে বলেছিল, সে আসেনি। আমার ফোন নেই যে তাকে ফোন করব। তাই আমি গিয়েছিলাম ফোন বুথ খুঁজতে।"

কথাটা বলে আমি মানুষটার সামনে 'আই টোয়েন্টি' কাগজটা দেখালাম। ইউনিভার্সিটি থেকে এটা পাঠিয়েছে আমায়। এটাকেই আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেট পাস বলা যেতে পারে।

লোকটা ভাল করে সেটা দেখলেন। তারপর মাথা নাড়লেন আর গ্লুটের ভাষায় আবার কিছু একটা বলে পকেট থেকে নিজের ফোনটা বের করে সামনে ধরলেন।

আমার সামান্য সময় লাগল। তারপর বুঝলাম, আরে ভদ্রলোক আমায় সাহায্য করছেন। ওর ফোনটা দিচ্ছেন কল করার জন্য।

আমি ক্রত ফোনটা নিয়ে সামুদার নম্বর মিলিয়ে কল করলাম।

ছ'টা রিং হওয়ার পর সামুদা ফোনটা ধরল।

আমি ফোনের মধ্যে দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লাম, "সামুদা, তুমি কোথায়? টেনশনে আমার হার্ট অ্যাটাক হবে এবার!"

সামুদা বলল, "কেন? তুই এসে গিয়েছিস? তোর ফ্লাইট রাত্রে আসবে না?"

"মানে!" আমি ঘাবড়ে গেলাম, "তোমায় কাল দুবাই এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করলাম না? ভুলে গেলে?"

সামুদা নাক টেনে জিজ্ঞেস করল, "সেটা আজকের সকালের জন্য?"

"সামুদা কী বলছ?" আমি কী করব বুঝতে পারলাম না, "কী হবে এখন?"

সামুদা বলল, "কী আর হবে? আমি আসব। এবার ফোনটা এই তালগাছকে ফেরত দে!"

"তাল গাছ!" আমি ঘাবড়ে গেলাম। সত্যি পাশে দাঁড়ানো লোকটা তালগাছের মতোই লম্বা!

আমি চট করে পিছনে ফিরলাম। আর দেখলাম আমার থেকে কুড়ি ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সামুদা। মুখে হাসি।

মনে হল দু'হাজার বছর পর বৃষ্টি নামল তাকলামাকানে!

আমি ফোনটা ফিরিয়ে দিয়ে ধন্যবাদ জানালাম। মানুষটিও বুঝতে পেরেছেন যে আমি যাকে খুঁজছিলাম সে এসে পড়েছে! উনি হেসে চলে গেলেন।

সামুদা এসে একটা সুটকেস টানতে-টানতে বলল, "শালা, পুরো কলকাতাকে নিয়ে এসেছিস নাকি ব্যাগে ভরে!"

আমি অন্য সুটকেসটা নিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

সামুদা বলল, "বাইরে আমার গাড়ি আছে। সরি রে অনেক লেট করেছি।"

"তুমিও পালটাওনি একটুও, না?"

সামুদা হাসল, "চুল পাতলা হয়ে গেছে। চোখে চশমা। দাড়ি পেকে গিয়েছে বেশ কিছু। পালটাইনি কে বলল রে?"

"এই যে লেট করলে!"

সামুদা তাকাল আমার দিকে। বলল, "এটা তো পারফেকশন! একে ইমপ্রুভ করে যায় নাকি?"

বাইরে এসে চারিপাশে তাকালাম। মনে হল এলইডি টিভিতে এইচডি ছবি দেখছি। এত পরিষ্কার! এত ঝকঝকে। আমি যে শহর থেকে এসেছি, আমি যেখানে বড় হয়েছি তার তুলনায় এটা তো কাপড় কাচার সাবানের বিজ্ঞাপন! সস্কেদি কা চমক!

আকাশের দিকে তাকালাম। কী নীল, কী নীল! আল্টামেরিন! তাতে ছোট-ছোট সাদা মেঘের তুলো ভাসছে। যেন কোথাও কোনও বিশাল একটা বালিশ ছিঁড়ে গিয়েছে!

গাড়ি ডিকিতে দুটো সুটকেস রেখে সামুদা এসে দাঁড়াল আমার কাছে। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, "কী দেখছিস?"

আমি বললাম, "এখানে পলিউশন নেই, না?"

সামুদা বলল, "কলকাতার চেয়ে অনেক কম। তাই ভিক্টিরিলিটি এত ভাল!"

"দারুণ," আমি চারিদিকে তাকালাম, "রাস্তাঘাটও তো খুব পরিষ্কার। ভাবা যায়!"

"গাড়িতে বস," সামুদা আলতো করে মাথায় চাটি মারল একটা, "এখানে মিনিমাম পাঁচ বছর থাকতে হবে। অনেক সময় পাবি এসব দেখার। একটা সময় আর দেখতেও ভাল লাগবে না। বুঝলি!"

গাড়ির সামনের ডান দিকের দরজা খুলে উঠলাম আমি। সামুদা বাঁদিকটা খুলে উঠল। আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে আবার এয়ারপোর্টটাকে দেখলাম। দেখলাম লেখা আছে, 'ডিএফডব্লিউ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট' অর্থাৎ ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট।

সামুদা গাড়িটা স্টার্ট করে বলল, "ডালাস আর ফোর্ট ওয়ার্থ টুইন সিটি। এই এয়ারপোর্ট দুটো শহরকেই কেটার করে। এখানে পড়তে এসেছিস আর এসব খবর নিসনি?"

আমি বললাম, "নিয়েছি তো।"

সামুদা হাত বাড়িয়ে গান চালাল এবার। খুব নিচু স্বরে আরডি বর্মন বাজতে লাগল।

আমি পুরো শরীরটাকে ছড়িয়ে দিলাম সিটে। ক্লান্ত লাগছে একটু। এতটা প্লেন জার্নি করিনি তো কোনওদিন। তবে একটা ব্যাপার, প্লেনে ঘুমিয়ে নিয়েছি কিছুটা। হঠাৎ মনে পড়ল, মা কী করছে এখন? ওখানে তো রাত! মা কি ঘুমিয়ে পড়েছে! একা বাড়িতে মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়ই! মামারা তো উপর তলায় থাকে। মা একা কাঁদছে কি? আচমকা মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। মায়ের মুখটা এমন করে মনে পড়ল যে, বুকের ভিতরে একটা গিঁট পড়ে গেল।

সামুদা আমার কানটা অল্প করে টেনে দিয়ে বলল, "কী রে ঘুম পাচ্ছে? জেট ল্যাগ?"

আমি চোখ খুলে তাকালাম। মসৃণ রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে। পাশে নানা ধরনের বাড়ি। মাঝে-মাঝে গাছ। কী সুন্দর! সবকিছুর মধ্যে একটা অদ্ভুত শৃঙ্খলা!

আমি বললাম, "সব এমন নিখুঁত কী করে আছে সামুদা? মনে হচ্ছে যেন কমপিউটারে প্রোগ্রাম করা! কী করে এমন হয়? আমাদের ওখানে তো এমন হয় না!"

সামুদা বলল, "আরে তুই কি এখনও সেই ক্লাস নাইনের বায়োলজিতে আটকে আছিস নাকি?"

"অ্যাঁ!" আমি অবাক হলাম।

সামুদা হাসল, "সেই যে উদ্ভিদ আর প্রাণী কোষের পার্থক্য! এর প্লাসটিড আছে, ওর মাইটোকন্ড্রিয়া আছে। তেমন। শোন, কলকাতার সঙ্গে এর তুলনা করিস না। এখানকার পার্সপেকটিভটা আলাদা।"

"মানে!" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সামুদা সামনের দিকে তাকিয়েই বলল, "এই দেশটার বয়স কত? পাঁচশো, সাড়ে পাঁচশো বছর। তাই তো? আমাদের দেশের সভ্যতার বয়স কত বল তো? পাঁচ হাজার বছর মিনিমাম! ভাবতে পারিস?"

আমি অবাক হলাম, "তো?"

সামুদা হেসে বলল, "সাড়ে চার হাজার বছর আগে ভারতবর্ষও এমন সাজানো-গোছানো আর সুন্দর ছিল। এমন চকচকে আর ডিসিপ্লিন্ড ছিল। আরও সাড়ে চার হাজার বছর পর দেখিস আমেরিকার কী হাল হয়!"

"মাইরি সামুদা!" আমি কী বলব ভেবে পেলাম না।

সামুদা বলল, "বাদ দে ওসব। পাড়ার সকলে কেমন আছে? ঝকিমা? তুই আসাতে কষ্ট পায়নি?"

আমি বললাম, "কষ্ট তো পেয়েইছে। কিন্তু আমার সামনে খুব একটা দেখায়নি। জানই তো কত শক্ত মানুষ!"

সামুদা এবার ড্যাশবোর্ড থেকে চিউয়িংগাম বের করে আমায় দিয়ে বলল, "আর? আর কী খবর?"

আমি জানি সামুদা কী বলতে চাইছে। কিন্তু উত্তর দিলাম না। সামুদা নিজে না জিজ্ঞেস করলে আমি কিছু বলব না।

সামুদা এবার তাকাল আমার দিকে। বলল, "জানিস তোর অ্যাপার্টমেন্টটা কোথায়? ৩ ডেস, ৫৬৫৭ অ্যামেসবারি ড্রাইভ। ভাল বেশ। দোতলায়। দেখিস ভাল লাগবে। একটা সাউথ ইন্ডিয়ান ছেলের সঙ্গে শেয়ার করতে হবে। ও নিজেও এসএমইউ-তে আছে। কলকাতায় থাকত। কেমন বাংলা বলে দেখবি!"

AMARBOI.COM

আমি একটু ভয় পেলাম, "ভেজ নাকি?"

সামুদা বলল, "সে নিজেই জিজ্ঞেস করিস। আর বাইরে এসেছিস, অত ভাবিস না। সব পরিস্থিতি ম্যানেজ করতে হবে। মনে রাখবি এখানে তোর কেউ নেই। সামুদাও না।"

"তুমি নেই?" আমি অবাক হলাম।

সামুদা আবার একটা ডান দিকের রাস্তায় ঢুকে বলল, "না নেই। ডোন্ট কাউন্ট মি। এটা রজনী সেন রোড নয় রিয়ান। ইউ আর ফার অ্যাওয়ে ফ্রম ইয়ার কমফর্ট জোন। রিমেমবার দ্যাট।"

আমি ঘাবড়ে গেলাম একটু। সামুদা এমন ব্যবহার করে না তো! কী হল?

আমি বললাম, "রেগে গেলে কেন সামুদা?"

সামুদা দাঁত চেপে বলল, "যেখানে সেখানে থুতু ফেলবি না। গারবেজ ফেলবি না। যখন তখন গাছের গোড়ায় প্যান্টের চেন খুলে দাঁড়িয়ে পড়বি না। এ দেশটা মুক্ত সুলভ শৌচালয় নয়। তেমন হলে না লাথি মেরে বের করে দেবে!"

আমি বুঝতে পারলাম কী হয়েছে!

সামুদা আবার বলল, "আর কখনও এগুপেষ্ট করবি না তোকে আমি গাড়ি করে কোথাও নিয়ে যাব। বরং তোকে বেবি সিটিং করার জন্য আমি এ দেশে আসিনি। আমার কাজ আছে। এখানে মুখে রক্ত তুলে খাটতে হয় আমায়। বুঝেছিস? আর.. আর..."

সামুদার মুখটা রাগে লাল হয়ে গিয়েছে।

আমি বললাম, "জল খাও একটু। আর শোনো সামুদা মিমিদির আরও-একটা ছেলে হয়েছে। মাসদু'য়েক হল।"

সামুদা আচমকা চুপ করে গেল। আমি পাশের থেকে দেখলাম চোয়াল শক্ত করে গাড়ির স্টিয়ারিংটা ধরে রেখেছে। মুখটা আরও লাল হয়ে গিয়েছে। যে-কোনও সময়ে যেন নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে।

আমি আবার বললাম, "সামুদা তুমি ঠিক আছ?"

সামুদা এবার তাকাল আমার দিকে, "এই জন্য বললাম তোকে, আমরা সবাই একা। কেউ কারও নয়, বুঝলি? না তুই আমার, না আমি তোর। না মিমি..."

আমি জানি ঘটনাটা। সেই না বোঝার বয়স থেকেই জানি। সবাই বলত, "আয়ান মিমির জন্য সব করতে পারে।"

সকলে বুঝত সেটা। শুধু মিমিদি বুঝত না। বা হয়তো বেশি বুঝত। তাই সারাটা জীবন স্যাডনেসকে নিয়ে খেলা করে গেল। কোনও-কোনও মানুষ এমন করে কেন কে জানে! ছোটবেলায় কি তাদের খেলনা কিনে দেয় না তাদের বাবা মায়েরা, যে পরে বড় হয়ে অন্য মানুষকে নিয়ে খেলে সেই আপূর্ণ সাধ মেটাতে হয়!

মিমিদি সামুদাকে সারা জীবন নাকে দড়ি পরিয়ে ঘুরিয়ে শেষে, "তোকে আমি কোনওদিনও ভালইবাসিনি সামু!" বলে অন্য একজনকে বিয়ে করে নেয়!

আমার মাথা হঠাৎ গরম হয়ে গেল। সামুদাকে কষ্ট পেতে দেখলে ছোট থেকেই আমার খারাপ লাগে। ফুটবল, টিনটিন, ফেলুদা, হলিউড সব তো এই মানুষটাই হাতে ধরে বুঝিয়েছে। আমার গুরু তো! কষ্ট হবে না!

আমসবেরি ড্রাইভ রাস্তাটা মোটামুটি চওড়া। চারটে গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে। এই রাস্তার দু'দিকে ছড়ানো 'দ্য ভিলেজ' নামের কমিউনিটি। এই 'দ্য ভিলেজ'টা নানা ছোট-ছোট অংশে বিভক্ত। তেমনই একটা অংশ 'দ্য ঢেস'। সেখানকার একটা বাড়িতে আমার থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে।

গাড়ির ভিতর থেকেই আমি আমার বাসস্থানটি প্রথম দেখলাম। বাড়িটা দোতলা। মেরুন আর সাদা রংয়ের। বাংলো ধরনের। কেবল ফিল্মেই এরকম বাড়ি দেখেছি। মনে হল, এখানে আমি থাকব!

গাড়ি থেকে নেমে সুটকেস দুটো বের করে দিল সামুদা। তারপর পকেট থেকে একটা মোবাইল বের করে বলল, "এটা আমার আরও-একটা মোবাইল। রাখ তোর কাছে। নিজের কানেকশন নিয়ে পরে আমায় এটা ফেরত দিয়ে দিস। বুঝলি? আমি আর উপরে যাব না। অফিস থেকে অনেক কষ্টে ম্যানেজ করে এসেছি। এবার তুই চলে যা। টু-সি অ্যাপার্টমেন্ট। এখানে কিন্তু একতলাকে গ্রাউন্ড ফ্লোর বলে না। ফার্স্ট ফ্লোর বলে। দোতলাকে সেকেন্ড। জানবি এরা সব কিছুর মধ্যে নিজেদের একটা আলাদা আইডেন্টিটি তৈরি করে রেখেছে। নাও, গো। আমি পরে খবর নেব। টেক রেস্ট।"

আমি বললাম, "তুমি কত দূরে থাকো?"

"এখান থেকে তিরিশ মিনিট ড্রাইভ। নিয়ে যাব তোকে। একটা স্টুডিয়ো আছে আমার। অফিস দিয়েছে। ও, বলতে ভুলে গিয়েছি," সামুদার যেন হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেল, "নানিয়া আসবে। বুঝলি!"

নানিয়া! আমি অবাক হয়ে গেলাম।

নানিয়া হীলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ফেসবুকে। এখানেই পড়তে এসেছে। সেই জন্যই আলাপ করেছিলাম। মানে, একদম কাউকে চিনব না এমনটা যেন না হয়, তাই নানিয়ার সঙ্গে কথা বলেছিলাম।

নানিয়া দিল্লির মেয়ে। কিন্তু দীর্ঘদিন নিউফিল্যান্ডে ছিল। আসলে ওর বাবা ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে আছেন। সেই জন্যেই পৃথিবীর বহু দেশে ঘুরেছে নানিয়া।

আমার থেকে ফেসবুকেই ও সামুদার মোবাইল নাম্বার নিয়েছিল। আমার অবাক লাগল। সামুদা আমায় এই অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা দেয়নি। কিন্তু নানিয়াকে দিয়েছে!

সামুদা গাড়িতে উঠে বলল, "কিছু দরকার হলে বলিস। আরও-একটা কথা, এখানে কারও থেকে বেশি আতিথেয়তা এগুপেষ্ট করিস না। এটা হিঙ্ক হিঙ্ক, হুজ হুজ দেশ। কেমন?"

আমি মাথা নাড়লাম।

গাড়িস্টার্ট করে আবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল সামুদা, "এই রিয়ান, গাড়িতে যা বলেছি সব ভুলে যা। ওটা এমনি বলেছি, বুঝলি?"

আমি হাসলাম। আমি কি তা জানি না? কেন রাগ করেছিল সামুদা, তাও কি বুঝি না আমি!

দোতলায় উঠতে হাঁপ ধরে গেল আমার। দু'বারে দুটো সুটকেস তুললাম। আমার অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় নম্বর লেখা আছে। সামুদা আমায় চাবি দিয়েছিল। কিন্তু ওই সাউথ ইন্ডিয়ান ছেলেটা শিশ্চয়ই আছে ভিতরে। তাই হুট করে ঢুকে পড়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না। আমি ছিধা নিয়ে ডোর নকারটা ঠুকলাম।

একটু সময় পরে দরজার ওপারে একটা শব্দ পেলাম। তারপর খুলে গেল দরজাটা। আর আমি ঘমকে উঠলাম! নানিয়া! একটাও শুধু স্ত্রিনেই দেখেছিলাম মেয়েটাকে। এবার চাক্ষুষ করলাম। লম্বায় প্রায় পাঁচ দশ। সামান্য চৌকো মুখ। বড় চোখ। টানা-টানা ভুরু! গালে ব্রণ হওয়ার স্মৃতিচিহ্ন। মাখনের সঙ্গে 'কে বেশি ফরসা' সেই নিয়ে মোকদ্দমা চলছে ধরনের গায়ের রং!

আমি এত অবাক হয়ে গেলাম যে কী বলব বুঝতে পারলাম না। আমার অ্যাপার্টমেন্টে আমি আসার আগে নানিয়া চলে এসেছে! সামুদা যে কী করে মাঝে-মাঝে।

"ওয়েলকাম," নানিয়া সরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলল।

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে সামান্য হেসে সুটকেস দুটোকে ঘরে ঢোকালাম। ভাবলাম, সেই আমার ফ্ল্যাটমেট ছেলেটি কই!

আমি দেখলাম ফ্ল্যাটটা। ছোট। সুন্দর। বসার জায়গায় একটা বড় সোফা পাতা। সেটাতেই যেন গোটা ঘর জুড়ে বিছিয়ে। তার এক পাশে ফ্রিজ আর কোণের দিকে রান্না করার জায়গা। এই বসার ঘরের দু'দিকে দুটো ঘর। বুঝলাম এর একটা আমার। কিন্তু কোনটা!

নানিয়া বলল, "চলো, তোমার ঘরটা দেখিয়ে দিই। তোমার রুমি আসছে। ওই তো আমায় বসতে দিল। ভাবলাম এসে তোমায় সারপ্রাইজ দিই। কেমন লাগল?"

আমি হাসলাম। ভালই লাগল। এমন ধারালো সুন্দরী একটা মেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে দু'হাত ছড়িয়ে ওয়েলকাম বলছে, খারাপ লাগার মতো অসুস্থ নাকি আমি!

কিন্তু তাও যতটা ভাল লাগার ততটা লাগছে না! মনে হচ্ছে সবই তো হল, কিন্তু আমি যদি এখন 'কিছু ভাল লাগছে না' বলে বাড়ি যেতে চাই, যেতে পারব না। মনে হচ্ছে ঘর থেকে পালানোর জন্য এই দেশে এলাম সত্যিই কি সেটা থেকে পালাতে পেরেছি! সেই এগারো বছর আগের সকালটার ছায়া কি আমি এখানে এসে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছি? ঝেড়ে ফেলতে পারব?

নানিয়া বলল, "কী হয়েছে?"

আমি হাসলাম, "না, জাস্ট গেটিং দ্য ফিল অফ ইট।"

নানিয়া নিজেই একটা ব্যাগ তুলে নিয়ে বাঁ দিকের দরজাটা খুলে ঢুকে গেল ঘরে। আমিও গেলাম পিছন-পিছন।

তারপর নিজের ঘরটা দেখলাম।

ছোট। একটা বিছানা রাখা দেওয়াল ঘেঁষে। মাথার কাছে দুটো জানালা। তাতে সাদা রংয়ের ব্লাইন্ড্স ঝোলানো। গোটা ঘরটার রং খুব আরামদায়ক!

নানিয়া আমার বিছানায় বসে হাত দিয়ে চাপড়ে ওর পাশে বসতে বলল। আমি হেসে বিছানায় বসতে যাব, এমন সময় ঘরের দরজার সামনে থেকে একটা গলা শুনলাম, "হাই গাইজ়!"

আমি ঘুরে তাকালাম। দোহারা চেহারার একটা ছেলে। মাথায় জমিয়ে তেল দেওয়া। চোখে স্টিল ফ্রেমের চশমা। কপালে একটা হরাইজ়ন্টাল তিলক।

ছেলেটা এসে হাত বাড়াল, "আই অ্যাম শরথ হরিহরণ আইয়ার! তুমি তো রিয়ানা। গুড নেম!"

আমি ওর বাড়ানো হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বললাম, "রাইট ইউ আর!"

শরথ বলল, "কিন্তু এর মানে কী? রিয়ান মানেটা কী? আমি ডিকশনারি দেখছিলাম, পেলাম না। এই ন্যাখো, এতে নেই।"

আমি দেখলাম শরথের হাতে ধরা আছে একটা ডিকশনারি। অক্সফোর্ড মিনি ডিকশনারি।

আচমকাই চোয়ালের কাছটা শিরশির করে উঠল আমার। চোখের সামনে এক ঝলক ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল একটা মুখ। মনে পড়ে গেল, ইশ! ডিকশনারিটা তো ফেলে এলাম! রাজিতা জানতে পারলে কী ভাববে!

তিন

রাজিতা

সুজাতাদির বাড়িটা দেখলে আমার মনে হয় আসলে এটা বাড়ি নয়, রাক্ষসের হাঁ! সল্ট লেকের এক কোণে এমন অদ্ভুত দেখতে বাড়ি কলকাতায় আর আছে কি না সন্দেহ! সুজাতাদির হাজব্যান্ড একজন নামকরা আর্কিটেক্ট। বিদেশেই থাকে বেশির ভাগ সময়। সুজাতাদি বলে, "হাবিজাবি বাড়ির ডিজাইন করতে-করতে পুরো মাথাটাই খারাপ হয়ে গিয়েছে গগনের। দেখেছিস কী বানিয়েছে এটা! দালির সাররিয়ালিজ়ম নাকি এটা! বোঝ!"

আমি বুঝতে চাই না। কী হবে বুঝে? এসব দালি-টালির আমি খুব কিছু জানি না। বুঝতে মনও চায় না। আমার রোজকার জীবনে এসবের কোনও জায়গা নেই। আমি জানি আমার জায়গা কোথায়। জানি আমায় কী করতে হবে। যেমন এখন আমার জীবনের প্রায়োরিটি হল একা চাকরি জোগাড় করা!

অটো থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে আমি গেটের দিকে এগোলাম।

বড় লোহার দরজা। পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বৃদ্ধন। সুজাতাদিদের দরোয়ান। আমায় দেখে হেসে গেটটা খুলে দিল। বাড়ির ভিতরে ঢুকেই একটা বড় ঘণ্টা দেখা যায়। প্রায় ছ'ফুট ব্যাসের একটা সিমেন্টের ঘণ্টা মাটিতে রাখা। এটা নাকি আর্ট! পাছে হাঁটা রাস্তা সেই ঘণ্টাকে পাক দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল সুজাতাদি। আমায় দেখে হাত তুলে বলল, "কী রে এত দেরি করলি আসতে! এমন তো করিস না!"

আমি হাসলাম। সুজাতাদি কী করে জানবে রাস্তার কী অবস্থা! শোভাবাজার থেকে অটো করে উল্টোডাঙা, আবার সেখান থেকে আরও-একটা অটোয় সল্ট লেক। তারই মাঝে কত দাড়ি, কমা, সেমিকোলনের মতো জ্যাম, সিগনাল আর গাড়ির ভিড়! ইচ্ছে থাকলেও কী করে পৌঁছব সময়ে?

একতলা থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা কেমন যেন নীল রঙের কাচ দিয়ে তৈরি। আমার ভয় লাগে, এই বুঝি পা পিছলে গেল।

দোতলার বারান্দায় বসে আছে সুজাতাদি। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। আজ সকালের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এখন আবার রোদ। সঙ্গে ভ্যাপসা গরম। সুজাতাদিদের গোটা বাড়িটা এয়ার কন্ডিশনড! তবে বারান্দায় যে এসি নেই সেটা তো বলাই বাহুল্য।

বাড়িটার চারিদিকে অনেক গাছপালা। সঙ্গে মাথার উপর পাখা ঘুরছে। ফলে অতটা গরম লাগছে না।

আমি বেতের চেয়ার টেনে বসলাম।

সুজাতাদি বলল, "কী অবস্থা করেছিস চেহারার? এমন পুড়িয়ে ফেলেছিস কেন সোনার রং! সানস্ক্রিন ইউজ় করছিস না?"

আমি হাসলাম। সুজাতাদি সারাক্ষণ আমার কী-কী করা উচিত সে কথা বলে। কিন্তু বোঝে না যে, আমার এসব ভাল লাগে না।

সুজাতাদি বলল, "ভগবান ঢেলে রূপ দিয়েছে তো তাই কদর করিস না! বুঝবি!"

বুঝব? না, আমি বুঝব না। আচমকা আমার মনের ভিতরটা শক্ত হয়ে গেল! কী বুঝব! কেন বুঝব! কার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহার করব? সুন্দর ছড়িয়ে বর্ষিব? ফিটিং কুর্তি পরব?

লোকে বলবে, কেন? নিজের জন্য! কিন্তু আমার নিজের জন্য কিছু করতে ভাল লাগে না। শুধু একজনের জন্য এসব কিছু করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে-ই যখন নেই, তখন আমার কী বা দিন কী বা রাত!

আমি দিইনি, কিন্তু কী করে যেন সুজাতাদি নিজেই আমার জীবনের দখল নিয়ে নিয়েছে!

ছোটবেলা থেকেই গানের দিকে ঝোঁক ছিল আমার। কিন্তু গান শেখার কথা বাড়িতে বলতে পারিনি কোনওদিন। শুধু একা-একা গান গাইতাম। সামনের বাড়ির ঠাকুরমা বলত আমার নাকি গানের গলাটা স্বাভাবিক! বলত, "তোর বাপটাকে বলিস না কেন তোকে গান শেখাতে!"

একবার ঠাকুরমা নিজেই কথাটা বলেছিল বাবাকে। আর সেই দিন রাতে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনেছিলাম বাবা আর মা এই নিয়ে কথা বলছে।

বাবা বলেছিল, "রাজি গান শিখতে চায়? খুড়িমা বলছিলেন! তুমি জানো কিছু?"

মা সেলাই করছিল কিছু একটা। দাঁত দিয়ে সুতো ছিঁড়ে বলেছিল, "শিখতে চাই বললেই তো হল না! খরচ জানো? হারমোনিয়াম কিনতে হবে। মাস্টারের মাইনে আছে। এসব ভেবেছ? পারবে?"

পারবে! এই ছোট্ট প্রশ্নটা বাবাকে একদম চুপ করিয়ে দিয়েছিল। আমি দরজার আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখেছিলাম বাবা মুখ ঠোঁট টিপে বসে রয়েছে। ফরসা মুখ লাল। চোয়াল শক্ত। বাবা খুব কষ্টে মনের মানুষ আমি জানি। সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম বাবা খুব কষ্টে কান্নাটা গিলছে।

আমাদের পেট ভর্তি! এমন অনেক কিছু সারা জীবন গিলে নিতে-নিতে আমাদের পেট একদম ভর্তি এখন! তাই মাঝে-মাঝে মনে হয় আর কিছু গিলতে পারব না হয়তো!

তবে আমার মন খারাপ হয়নি। কারণ আমি তো জানতাম আমার কী-কী পাওয়া হবে না! কিন্তু ঠাকুরমা দমে যায়নি। নিজেই যোগাযোগ করেছিল এখানে ওখানে। তারপর বাবাকে ঠিকানা দিয়েছিল একটা। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুজাতাদির ঠিকানা।

বারো বছর হল আমি গান শিখছি সুজাতাদির কাছে। কোনওদিন সুজাতাদি এক পয়সাও নেয়নি। বরং উল্টে আমাকে কত কিছু যে দিয়েছে! সুজাতাদির ছেলেমেয়ে নেই। শুধু স্বামী-স্ত্রীর সংসার। আমরা ছাত্রছাত্রীরাই সুজাতাদির কাছে সব।

সুজাতাদি বলল, "কী রে কোন দিকে মন তোর? কথা কানে যাচ্ছে না?"

আমি কাঁধের ব্যাগটা সামনের টেব্‌লে রেখে পাশের প্লেট থেকে একটা বিস্কুট তুলে নিয়ে বললাম, "কী বলব? আমার ওসব সান্সিনি-টিন ভাল লাগে না!"

সুজাতাদি বিরক্ত হয়ে বলল, "খালি চোপা! কিছুই ভাল লাগে না! এই চব্বিশেই যদি কিছু ভাল না লাগে তবে ভবিষ্যতে কী করবি? একদিন তো আমাদের মতো বয়সও হবে! এই বয়সে একটা প্রেমও করলি না এখনও! হ্যাঁ, তোর কি মেয়েদের ভাল লাগে?"

আমি হাসলাম, "সত্যি সুজাতাদি! তুমি পারো!"

সুজাতাদি বলল, "কেন? পারো বলছিস কেন? আমার তো মনে হয় ওটাই বেস্ট! ছেলেগুলো সব বদের বাসা! মেয়েদের সঙ্গেই মেয়েদের প্রেম হওয়া উচিত। তোরও কি তেমন মনে হয়?"

আমি বললাম, "না, আমার ছেলেদের সঙ্গেই প্রেম হবে, মানে কোনও দিনও যদি হয়!"

সুজাতাদি মুখ বেঁকিয়ে বলল, "তবে তুই মরেছিস আর কী!"

আমি বিস্কুটটা শেষ করে পাশের বোতলটা তুলে জল খেলাম। তারপর হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুখটা মুছে বললাম, "কী ঠিকানা দেবে বলেছিল! দেবে না?"

"ও, হ্যাঁ!" সুজাতাদির যেন মনে পড়ে গেল, "দাঁড়া দিচ্ছি! আসলে ও আমার দূর সম্পর্কের ভাই হয়। নাম আকাশ। আকাশ বাসু। দীর্ঘদিন ও অস্ট্রেলিয়ায় ছিল। এখন এখানে একটা মিউজিক চ্যানেলের হেড হয়ে এসেছে। গত পরশু এসেছিল আমাদের বাড়িতে। তখন কথায়-কথায় বলেছিলাম তোর কথা।"

আমি কিছু না বলে তাকিয়ে রইলাম। বেশ কয়েকদিন আগে সুজাতাদিকে বলেছিলাম কাজের ব্যাপারে। সুজাতাদি শুনেছিল। কিন্তু কিছু বলেনি।

সুজাতাদি টেব্‌লের উপর রাখা একটা ডায়েরি খুলে তার থেকে ছোট একটা চিরকুট বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

আমি দেখলাম ওটা আসলে একটা ভিজিটিং কার্ড। পিছনে হাতে লেখা একটা নম্বর। মোবাইলের।

সুজাতাদি বলল, "শোন। এটা আকাশের প্রাইভেট নাম্বার। এটাতে একটা ফোন করবি। আমি তো বলেই রেখেছি, তুই শুধু আমার রেফারেন্স দিবি।"

আমি বললাম, "এটা তো তুমি আমাকে ফোনেই বলে দিতে পারতে।"

"না পারতাম না," সুজাতাদি হঠাৎ নিজের চেয়ারটা টেনে আমার পাশে এসে বসল। তারপর নিচু স্বরে যেন ভয়ঙ্কর কোনও গোপন কথা বলছে তেমন গলায় বলল, "শোন আকাশ দেখতে খুব সুন্দর। ছ'ফুটের উপর লম্বা। গমের মতো গায়ের রং। অ্যাথলেটিক বডি। বয়স তিরিশ। দেখিস খুব পছন্দ হবে।"

আমি হেসে বললাম, "তুমি আমার চাকরির জন্য বলেছ, না বিয়ের জন্য?"

সুজাতাদি বলল, "দূর বোকা মেয়ে, দুটোই ইমপর্ট্যান্ট। অমন একটা ছেলেকে বিয়ে করতে পারলে কেরিয়ার স্লাস লাইফ দুটোই সেট হয়ে যাবে। তুই বুঝিস না কিছু!"

আমি হাসলাম। আসলে কিছু হাসলাম না একটুও। বরং আমার চোখের সামনে আবার দপ করে উঠল একটা মুখ। অভিমানী, রাগী একটা মুখ। যেন শুনতে পেলাম, 'আমি তোর কেউ নই। তুইও আমার কেউ নোস!'

সুজাতাদি বলল, "নে, আমার সামনে ফোনটা কর।"

আমি অবাক হলাম, "এখন!"

সুজাতাদি বলল, "কেন, তোর আপত্তি আছে? কর বলছি!"

আমি সময় নিলাম একটু। তারপর মোবাইলটা বের করে কার্ডের পিছনে হাতে লেখা নাম্বারটা ডায়াল করলাম।

দু' বার রিং হতেই ফোনটা ধরা হল ওই দিক থেকে। যে হ্যালো বলল, তার গলাটা বেশ ভারী।

আমি বললাম, "নমস্কার, আমি রাজিতা চক্রবর্তী বলছি। সুজাতাদির রেফারেন্সে..."

"ও হ্যাঁ," আমায় কথাটা শেষ করতে দিল না ওপাশের লোকটি। বলল, "আমি আকাশ। হ্যাঁ সুজিদি তো বলেছিল আপনার কথা।"

আমি বললাম, "তো, মানে..."

আকাশ বলল, "আমরা নতুন কিছু ছেলেমেয়েকে রিক্রুট করছি। আপনি কি ইন্টারেস্টেড?"

আমি বললাম, "শিওর। সেই জন্যই তো ফোন করলাম।"

"গুড," আকাশ হাসল, "আপনি আজই চলে আসুন। আমিই গোটা ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করছি। খুব ইনফরম্যালি কাজ করি আমরা। আমার কার্ডেই তো অ্যাড্রেস দেওয়া আছে।"

"ক'টা নাগাদ আসব?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এখন ক'টা বাজে? সাড়ে দশটা তো! আপনি বারোটায় আসুন।"

আমি ধন্যবাদ দিয়ে ফোনটা রেখে দেখলাম, সুজাতাদি এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন আমার থেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে কি হবে না এর নিশ্চিত খবরটা পেলে।

আমি ফোনটা ব্যাগে রেখে বললাম, "আজ যেতে বলেছে। বারোটা নাগাদ।"

সুজাতাদি শিশুদের মতো উৎসাহিত গলায় বলল, "লেভেল ওয়ান কমপ্লিটেড?"

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। আরে আমার জীবনটা কমপিউটার গেমস নাকি! আরে কিসের লেভেল? কতগুলো লেভেল? একটা চাকরি দরকার। আমি তো ইকোনমিক্স নিয়ে অনার্স করেছি। গানটা মোটামুটি জানি। এর উপর ভরসা করে যে যা কাজ দেবে করার চেষ্টা করব।

সুজাতাদি উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে টানল, "ওঠ। মুখটা ধুয়ে নে একটু। বাথরুমে যা। ফেস ওয়াশ আছে। তারপর আসবি, আমি একটু সাজিয়ে দেব।"

"মানে!" আমি চোখ গোল করলাম, "কী বলছ তুমি?"

সুজাতাদি বলল, "শোন, সেজে যাবি সব সময়।"

আমার এবার একটু বিরক্ত লাগল। কিন্তু সেটা দেখালাম না। বরং স্বাভাবিক গলায় বললাম, "আমি তো বিয়ের সম্বন্ধে যাচ্ছি না।"

"সে তোকে ভাবতে হবে না। সেদিন তোর ছবি দেখিয়েছি ওকে। আমাদের লাস্ট ফাংশনের ছবিগুলো। আকাশ দেখে বলল, এতটা সুন্দর দেখতে!" সুজাতাদি খুশি হয়ে তাকাল আমার দিকে।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এসবের যে কোনও প্রভাব আমার উপর পড়ে না সেটা সুজাতাদি জানে না?

"তবে," সুজাতাদি একটু থমকাল এবার। তারপর বলল, "তোকে একটা কথা বলা দরকার। আকাশের পার্সোনাল লাইফ সম্পর্কে।"

আমি বললাম, "প্লিজ সুজাতাদি আমি এসব জানতে চাই না। উনি আমায় আজ ডেকেছেন। ইন্টারভিউ দেব। সেটুকু সম্পর্কই থাক না।"

"আঃ, একটু এসব বলতে দে না আমায়!" সুজাতাদি বলল, "খালি বাধা দেয়! জানিস তো এসব হাঁড়ির খবর দেওয়া-নেওয়া না করলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি!"

আমি হাসলাম। কথাটা ঠিক। তবে সুজাতাদি এমন করে বলে যে রাগ হয় না।

বললাম, "বলো তবে।"

"ও না ডিভোর্সি!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তো?" আমি ভুরু তুললাম।

"না, কিছুই না।" সুজাতাদি বলল, "তোকে জাস্ট জানিয়ে রাখলাম। একটা অস্ট্রেলিয়ান মেয়েকে বিয়ে করেছিল সাতাশ বছর বয়সে। দু'বছরের মাথায় মেয়েটা ওকে ছেড়ে চলে যায়। ই ওয়াজ তেরি আপসেটে। তবে এখন ঠিক আছে। সেই কারণেই এ দেশে চলে এসেছে। স্টার্টিং আফেশ!"

আমি কিছু না বলে উঠলাম।

"কী রে উঠলি!" সুজাতাদি জিজ্ঞেস করল। তারপর যেন মনে পড়ে গেল ব্যাপারটা, "ও তুই তো যাবি! শোন না লক্ষ্মী মেয়ে আমার। মুখটা একটু ধুয়ে যা অন্তত। মেকআপ করতে হবে না!"

আমি বললাম, "এখান থেকে ভবানীপুরে ওই অফিসে যাব সুজাতাদি। মুখ ধুয়ে কী লাভ! বাস-মেট্রোয় আবার যেই কে সেই হয়ে যাবে তো!"

সুজাতাদি যেন এবার বুঝতে পারল ব্যাপারটা। বলল, "তাও ঠিক। শোন না তোকে শোভাবাজার মেট্রো অবধি রতনকে বলব ছেড়ে দিয়ে আসতে? এ তো বসেই আছে এখন।"

রতনদা সুজাতাদিদের গাড়ি চালায়। বয়স্ক লোক। খুব শান্ত। আমি চিনি।

বললাম, "না গো, অটোয়-অটোয় চলে যাব।"

সুজাতাদি বলল, "আসলে আমি বুঝতে পারিনি যে ও তোকে আজকেই ডেকে নেবে ইন্টারভিউতে। ভেবেছিলাম কথা বলে কাল বা পরশু ডেট দেবে। আর তুই আজ দুপুরে আমার সঙ্গে যাবি! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ডাকল! আসলে তোকে আবার সেই অত দূর ঠ্যাঙাতে হবে তো! তবে..."

আমি অবাক হয়ে তাকালাম।

সুজাতাদি হেসে বলল, "তোর ছবি দেখেছে বলেই ও এতটা ইন্টারেস্টেড বোধ হয়। মনে হচ্ছে লেভেল টু-ও কমপ্লিট!"

অটোয় উঠে বাইরের দিকে তাকালাম। আকাশে আজ রোদ্দুর। তাদের প্যাচপ্যাচ গরমে সমস্ত শহরটার গায়ে কে যেন নিরিট্ট চটচটে রস মাখিয়ে দিয়েছে! আমি ওসে রয়েছি পিছনের সিটের কোনায়। আমার পাশে একটা মোটা লোক বসে রয়েছে। মোবাইল কানে ধরে গাঁক-গাঁক করে চেঁচিয়ে হিন্দিতে কথা বলছে কারও সঙ্গে। আর কথার সঙ্গে ছোট-ছোট মশলার কুচি উড়ছে হাওয়ায়!

আমি সিটিয়ে বসে রয়েছি। এমন লোকজন দেখলে ঘেন্না করে আমার।

খুব কম হলেও এক-একদিন রিয়ানের মেজাজ ভাল থাকত। সেই দিনগুলোয় ও বলত, "তুই বাতিক-বুড়ি! এত শুচি বায়ুগ্রস্ত হলে হয়!"

আমি রাগ করতাম ওর কথায়। বলতাম, "তোর মতো হতে পারব না! একটা স্যান্ডো গেঞ্জি দু'দিন পরিস! সপ্তাহে একদিন শেভ করিস! নোংরা!"

রিয়ান হাসত আর বলত, "আয় ন্যাখ আমার গায়ে কেমন গন্ধ!"

বলতো আর আচমকা জড়িয়ে ধরত আমায়। আমি নিজেকে ছাড়াবার জন্য ছটফট করতাম। কিন্তু সত্যি বলতে কী ছাড়াতে চাইতাম না নিজেকে। মনে হত আরও জড়িয়ে ধরে থাকুক ও আমায়। আরও শক্ত করে ধরুক। ওর গায়ের থেকে সুইস আর্মি পারফিউমের গন্ধ যেন আমার শরীরের অণু-পরমাণুতে ছড়িয়ে যেত। ভাললাগায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসত। নিজের অজান্তে ওর শার্টের কোনাটা চেপে ধরতাম! রিয়ান আরও কত কী যে বলত! হাসত। চিৎকার করে অদ্ভুত শব্দ করত মুখ দিয়ে। আর আমি বিড়ালের মতো ওর সঙ্গে লেপ্টে ওর গায়ের গন্ধ নিতাম। মনে হত যতটা পারা যায় ওকে ভেমিয়ে রাখি নিজের মধ্যে!

কেন জানি না সব সময় মনে হত রিয়ান আমায় ছেড়ে চলে যাবে। মনে হত এই যে পাঁচ বছর বয়স থেকে আমরা দু'জন দু'জনকে চিনি সেটা এক সময় ভেঙে যাবে। একটা সময় আসবে যখন এই পৃথিবীতে রিয়ান থাকবে, রাজিতাও থাকবে। কিন্তু ওদের আর দেখা হবে না কোনওদিন!

যখন আমার বাবা আর রিয়ানের বাবার আলাপ হয়েছিল তখন আমার বয়স পাঁচ। তারপর কিসের থেকে যে কী হল, বাবারা দু'জনেই বন্ধু হয়ে গিয়েছিল খুব। তার ফলে আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

সেই পাঁচ বছর বয়স হলেও আমার আজও মনে আছে রিয়ানকে প্রথম দেখার দিনটার কথা। সেটা শীতকাল ছিল। ডিসেম্বর মাস। আমাদের বাড়িতে এসেছিল ওরা। আমি ড্রয়িং করছিলাম বাবার ঘরে খাটে বসে। বাবা-মায়ের সঙ্গে রিয়ান এসে ঢুকেছিল ঘরে। সকালবেলা ছিল সেটা। পুবের জানালা দিয়ে ওই সময়টায় রোদ আসে বাবার ঘরে।

সেদিনও রোদের একটা স্তম্ভ এসে পড়েছিল ঘরের ভিতর। আর তার ভিতর উড়ে বেড়াচ্ছিল অসংখ্য ধুলো-কুচি। আমি মুখ তুলে দেখেছিলাম লাল সোয়েটার আর কালো ফুলপ্যান্ট পরা একটা ছেলে। মাথার চুল পেতে আঁচড়ানো। ধুতনিতে টোল! ছেলেটা হাত তুলে সেই ধুলো-কুচি ছোঁয়ার চেষ্টা করছে!

আমরা জানি না জীবনের কোন মুহূর্তে কীভাবে আমাদের বেঁচে থাকার গতিপথ বদলে যায়! জানি না কী থাকে কোনও এক মুহূর্তে যে সেটাই নিভৃতে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের বাকিটা জীবন!

সেই ছোট বয়সে আমি কিছুই বুঝিনি। কিন্তু কেমন যেন কর্পূরের গন্ধ পেয়েছিলাম হাওয়ায়! মনে হয়েছিল, ওই আলোর দোকানসের তলায় দাঁড়িয়ে থাকা লাল সোয়েটার পরা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থাকি অনন্তকাল!

সেই শুরু। তারপর আমাদের মধ্যেও অদ্ভুত এক বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল! প্রায়ই আমাদের দেখা হত। গল্প হত। ঝগড়া হত। রাগ করত রিয়ান। অল্পতেই রেগে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকত। আর আমায় ওর রাগ ভাঙাতে হত। ওকে বোঝাতে হত।

তারপর আরও একটু বড় হওয়ার পর যখন দেখলাম যে, কোনও সপ্তাহে রিয়ানকে না দেখতে পেলে মন খারাপ করছে, কান্না পাচ্ছে। যখন সকালে উঠে দেখলাম প্রথম ওর মুখ মনে পড়ছে আর রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে শেষ ওর কথাই ভাবছি। যখন বৃষ্টি পড়লে ওর কাছে গমনে ইচ্ছে করত! রবি ঠাকুরের 'তুমি রবে নীরবে' শুনলে ওর মুখটা মনে পড়ত! শাহরুখ খান আর কাজলের সিনেমা দেখলে মনে হত ওর হাতটা একটু ধরি! তখনই বুঝেছিলাম কিছু একটা গোলমাল হয়েছে মনে!

তবে সেই ক্লাস সেভেনের বয়সে নিজের মনের অবস্থাটা তো নিজের মনেই শুধু কৌটো বন্ধ হয়ে থাকত না! বরং সেটা উপচে বাইরে পড়তে চাইত! আশপাশে ছড়িয়ে পড়তে চাইত!

এখনও মনে আছে একদিন টিফিন পিরিয়ডে পিউকে বলেছিলাম সবটা।

পিউ মানে পিউ ব্যানার্জি! আমাদের ক্লাসেই পড়ত। বরাবর ফার্স্ট হত। দারুণ গান গাইত। আর দেখতেও ছিল ভাল। তবে অহঙ্কারী ছিল একটু। কেউই খুব একটা পছন্দ করত না পিউকে। কিন্তু আমার খুব ভাল লাগত মেয়েটাকে। আমি মনে-মনে ওকেই বেস্ট ফ্রেন্ড হিসেবে দেখতাম। তাই পিউকে বলেছিলাম আমার মনের কথাটুকু।

পিউ আমার কথা মন দিয়ে শুনে জিজ্ঞেস করেছিল, "তুই এসব সত্যি ফিল করিস? ওর কথা বারবার মনে পড়ে? কি কখন-কখন মনে পড়ে?"

আমি যথাসম্ভব উত্তর দিয়েছিলাম ওর সব প্রশ্নের! আর পিউও ডাক্তারের মতো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব জেনে নিয়েছিল। তারপর মুখ গম্ভীর করে বসে পা দুলিয়ে বলেছিল, "বুঝেছি তোর কী হয়েছে!"

আমার কিছু হয়েছে! আমি নিরুপায় রোগীর মতো তাকিয়েছিলাম পিউয়ের দিকে। পিউও অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "বুঝতে পারছিস না কী হয়েছে?"

আমি মাথা নেড়ে বলেছিলাম, "না!"

পিউ বলেছিল, "প্রেম! আমার যেটা পাড়ার বজ্জেলরাকে দেখে হয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনই তোর ওই রিয়ানকে দেখে হয়েছে! বুঝেছিস!"

প্রেম! আমার! আচমকা আমার সারা গায়ে কদম ফুটে উঠেছিল! কে যেন সারা আকাশ জুড়ে কটন ক্যান্ডি ছড়িয়ে দিয়েছিল নিমেষে! যেন হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছিলাম 'তুঝে দেখা তো ইয়ে জানা সনম!' গানটার গূঢ় অর্থ!

আমি বলেছিলাম, "সত্যি! প্রেম!"

পিউ জিজ্ঞেস করেছিল, "কিস করেছিস?"

"দিদি নামবেন না?" আচমকা ঘোর ভাঙল আমার। দেখলাম অটো এসে দাঁড়িয়েছে শোভাবাজার মেট্রোর সামনে। পুরনো কথা মনে পড়লেই কেমন যেন ঘোরের মধ্যে চলে যাই আমি। উল্টোডাঙায় অটো পালটে কখন যে এখানে এসে পৌঁছলাম বুঝতেই পারিনি!

আমি ভাড়া দিয়ে নেমে পড়লাম। সামনেই মেট্রো স্টেশন। শোভাবাজার থেকে নেতাজি ভবন পৌঁছতে সময় লাগবে না বিশেষ। এখনও হাতে পৌনে এক ঘন্টা মতো সময় আছে।

আমি এদিক-ওদিক দেখে রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাথে উঠলাম। আমার একটা মেট্রোর কার্ড আছে। তাই ওই লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

একটা পানের কোকানের সামনে বেশ ভিড়। কী নিয়ে যেন ঝগড়া হচ্ছে! আমি সেই জটলার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম শোভাবাজার-সুতানুটি মেট্রোর দরজার দিকে। আর ঠিক তখনই ব্যাগের ভিতরটা নড়ে উঠল! মোবাইল!

আমি ভাবলাম এখন কে আবার ফোন করল! অনেক জায়গায় তো রেজিউমে জমা দিয়ে রেখেছি। তেমনই কোনও অফিস থেকে নাকি!

ফোনটা বের করে দেখলাম বাবার মোবাইল নম্বর! বাবা তো এমন সময় কখনও ফোন করে না! তবে?

আমি ফোনটা ধরে কানে লাগালাম, "হ্যালো বাবা।"

"না, আমি আপনার বাবা, মানে রজতদা নই। আমি ওঁর সঙ্গে ফ্যাক্টরিতে কাজ করি। আপনি একবার এখুনি আসতে পারবেন?"

"আমি? কেথায়?" নিমেষে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল! মাথাটাও ঘুরে গেল যেন!

লোকটা বলল, "লিলুয়াতেই। এখুনি আসুন। স্টেশনের কাছে ডিফেন্সাল্ড নার্সিংহোমে। উনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"

"কী?" আমার হাত থেকে প্রায় পড়ে গেল ফোনটা। বাবা অসুস্থ! আমি কোনওমতে জিজ্ঞেস করলাম, "বাবার কী হয়েছে?"

"প্লিজ় তাড়াতাড়ি আসুন। দেরি করবেন না। আসুন," লোকটা কথা না বাড়িয়ে কেটে দিল মোবাইলটা।

আমি ফোনটা কানে ধরে দাঁড়িয়েই রইলাম। চারিদিকে ব্যস্ত শহরটা কেমন যেন নিমেষে আবছা হয়ে গেল! মনে হল, আমার পা দুটো কেউ যেন পেরেক দিয়ে পুঁতে দিয়েছে মাটির সঙ্গে! মনে হল, সারা শরীর জুড়ে ঝিঁঝিঁ ডেকে চলেছে একটানা। ভুলে গেলাম কোন দিকে গেলে লিলুয়া বলে জায়গাটায় পৌঁছনো যায়! বা আদৌ পৌঁছনো যায় কি না!

চার

রিয়ান

মা কী করছে এখন? আমি দেওয়ালের ঘড়িটা দেখলাম। রাত সাড়ে আটটা বাজে। মানে দেশে তো প্রায় সকাল দশটা। মা তো এখন রান্না করে! ফোনটা রান্নাঘরেই নিয়ে যায় সঙ্গে করে। তা হলে ধরছে না কেন? তবে কি মায়ের শরীর খারাপ? নাকি আজ সেই দিনটা বলে মায়ের অন্যরকম কষ্ট হচ্ছে! খুব ভিজ়া হচ্ছে আমার!

আজ কলেজ শুরু হয়েছে। তাই সকালে যাওয়ার আগেও মাকে ফোন করেছিলাম। তখনও ধরেনি। ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছি না। আজ সেই দিনটা বলেই চিন্তা বেশি হচ্ছে! এখানে আসার আগে মাকে আমি ইমেল করতে শিখিয়ে দিয়ে এসেছি। কিন্তু মায়ের থেকে কোনও ইমেলও আসেনি।

মন ঘোরাতে আমি ফোন হেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। সাদা ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে মানানসই সাদা হ্যালজেন ব্লাইন্ডস। সবার ভেতরে আমি খুলে দিই ব্লাইন্ডসটা। এখানের জানালাগুলো খোলা যায় না। মানে এই ক'দিনে একটা ব্যাপার দেখেছি যে কেউই এখানে খুব একটা জানালা খোলে না। সবার জানালাই কাচে ঢাকা।

আসলে সবক'টা বাড়িতেই এয়ার কন্ডিশনার বসানো আছে। গোটা বাড়িতেই সেই ঠান্ডা ভাব অনুভব করা যায়। শরথ আমায় দেখিয়েছে যে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের এসি-টা আমাদের বাথরুমের উপরে একটা লম্বাট ধরনের জায়গায় বসানো আছে। শীতকালে এটাকেই হিটার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু ডালাসে এখন গরমকাল। বাইরের তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মতো থাকে সকালবেলা, আবার রাতে হয় কমে তাপমাত্রা বেশ কিছুটা কমে দাঁড়ায় কুড়ি থেকে পঁচিশের মতো।

এখানে রেসিডেনশিয়াল এলাকায় রাস্তায় লোকজন এমনিতেই খুব কম থাকে। আজ যেন আরওই নেই! রাস্তায় তেমন আলোও থাকে না এখানে।

আমি আবার বসে পড়লাম বিছানায়। আজ সামুদার বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে। আমায় আর নানিয়াকে যেতে বলেছে সামুদা। তাই নানিয়ার অপেক্ষা করছি।

এখানে এই এক বাজে জিনিস। কিছু করার থাকে না। এখনও পড়াশোনা শুরু হয়নি। তাই হয়তো এমন বেকার লাগছে নিজেকে। পড়াশোনা একবার শুরু হয়ে গেলে আমি জানি আর সময় পাব না। এখানে এসে একটা জিনিস বুঝেছি কেউই বাজে সময় নষ্ট করে না।

গতকাল প্রথম ইউনিভার্সিটি গিয়েছিলাম। কিছু ফরম্যালিটি ছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকাউন্টও খুলতে হয়েছে। তবে সবটাই খুব সহজভাবে হয়েছে। কোথাও কোনও ঝামেলা পোহাতে হয়নি। এমনকী, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও খুলতেও মাত্র মিনিট দশেক লেগেছে। গোটা ফরম্যালিটিটায় নানিয়া আমার সঙ্গেই ছিল।

আমাদের বাড়ি থেকে হেঁটে ইউনিভার্সিটি যেতে মিনিট তিরিশেক সময় লাগে। গতকাল হেঁটেই গিয়েছিলাম। ফিরেওছিলাম হেঁটে। নানিয়ার বাবা বলেছিল পৌঁছে দিতে যাবে। কিন্তু আমি বারণ করেছিলাম। এমন ফাঁকা জায়গায় হাঁটার সুযোগ তো জীবনে পাইনি খুব একটা।

আমি আজও ভেবেছিলাম হেঁটেই যাব। শুধু একটু তাড়াতাড়ি বেরোলেই হবে। কিন্তু শরথ বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, "তুই হেঁটে যাবি কেন? এখানে একটা বাস যায়। কাছেই স্টপ। বেল এসএমইউ শাট্‌ল। চল আমার সঙ্গে।"

শরথরা আসলে কেরলের লোক। কিন্তু ওর বাবা কর্মসূত্রে প্রথম থেকেই কলকাতায় আছেন। শরথের জন্মও তাই কলকাতায়। তবে টুয়েলভ পাশ করার পর থেকে ও কলকাতা ছাড়া। শরথ ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিল কানপুরে। সেখান থেকে এখানে এসেছে।

ছেলেটা পড়াশোনায় খুব ভাল। আর সামান্য টান থাকলেও বাংলাটা বলবার করে বলে। কমিকস আর ফিল্মের পোকা। তবে প্রশ্ন করে খুব! আমি ঘুম থেকে উঠে আমার ঘরের বাইরে বেরোলেই জিজ্ঞেস করে, "কী রে ঘুম থেকে উঠলি? ঘর থেকে এই বেরোলি?"

আমি কী উত্তর দেব ভেবে পাই না। শুধু মাথা নাড়ি।

আমাদের এখান থেকে নিনি পাঁচেক হাঁটলে একটা বাসস্ট্যান্ড। আমি আর শরথ গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ওখানে। আমার বুকের ভিতর একটু ঢিপঢিপ করছিল। কেমন হবে ইউনিভার্সিটি কে জানে? আমাদের এখানের থেকে একেবারে আলাদা সেটা তো বলাই বাহুল্য!

শরথ আমার এক বছর আগে এসেছে এখানে। ও সারাটা রাস্তা জুড়ে বকবক করে মাথা খেয়ে নিয়েছিল আমার। তবে তাতে ইনফরমেশনের চেয়ে প্রশ্নই ছিল বেশি। "কলকাতায় এখন দুর্গাপুজো কেমন হয়?" "ক'টা ফ্লাই ওভার হয়েছে?" "মেট্রো রেল কতটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

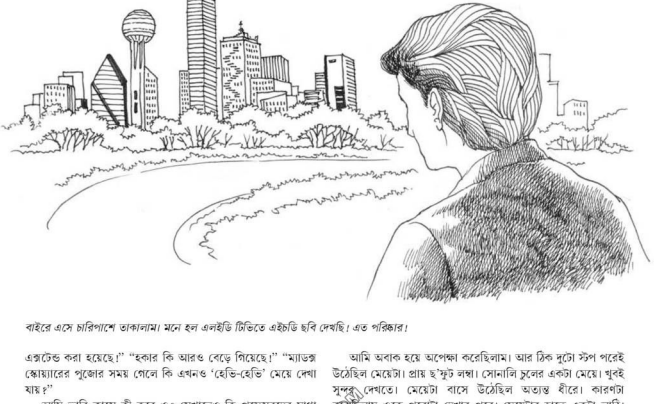

বাইরে এসে চারিপাশে তাকালাম। মনে হল এলইডি টিভিতে এইচডি ছবি দেখছি! এত পরিষ্কার!

এক্সটেন্ড করা হয়েছে!" "হকার কি আরও বেড়ে গিয়েছে!" "ম্যাডক্স স্কোয়্যারের পুজোর সময় গেলে কি এখনও 'হেভি-হেভি' মেয়ে দেখা যায়?"

আমি ভাবি ক্লাসে কী করে ওঃ সেখানেও কি প্রফেসরদের মাথা খারাপ করে দেয় প্রশ্ন করে-করে?

বাসটা বেশ বড়। সামনের দিকের দরজাটা ভাঁজ করে খুলে গিয়েছিল। আমি শরথের পিছনে উঠে পড়েছিলাম। এই বাসে টিকিট কাটতে হয় না।

শরথ বলেছিল, "এটাই ভাল বুঝলি। তবে হাতে সময় থাকলে হাঁটতেও পারিস।"

সস্তা ব্যাপারটা যে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা এই দু'-তিন দিনেই বুঝে গেছি। আমি প্রতি বছর সাড়ে ষোলো হাজার ডলার পাব স্কলারশিপ বাবদ। তবে নানা ট্যাক্স কেটে হাতে এসে পৌঁছবে সাড়ে পনেরোর মতো। আর সেটাই ভাগ করে দেওয়া হবে সারা বছর ধরে। তবে বারো মাস নয়, দেওয়া হবে দশ মাসে। মানে এই সাড়ে পনেরো হাজার ডলারে আমায় কাটাতে হবে একটা বছর! অর্থাৎ মাসে প্রায় তেরোশো ডলার করে থাকবে হাতে।

আমার বাড়ির অবস্থা এমন নয় যে, মা টাকা পাঠাবে। তাই এই সবেধন নীলমণিটুকুই সম্বল! এখানে অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া সাতশো ডলার। মোবাইল আর নেট কানেকশন বাবদ একশো ডলার আর খাওয়া খরচ দু'শো ডলার মতো। মানে তিনশো ডলার পড়ে থাকবে হাতে। এটাই আমার অন্ধের যষ্টি!

আমি বাড়িতে থাকাকালীন খুব একটা হিসেব করতাম না। যখন যা টাকার দরকার মা দিত। আর রাজি তো ছিলই। ও নিজেই অনেক কিছু কিনে আনত। আমার ঘরদোর গুছিয়ে দিত। কিন্তু এখানে আমার বিছানা তোলা থেকে খাবার তৈরি করা সব করতে হয়। সঙ্গে টাকার হিসেব! এই ক'টা দিনেই আমার দম বন্ধ লাগছে। পাঁচ বছর আমি কী করব এখানে?

শরথ সিটে বসেই বলেছিল, "তোকে একটা কথা বলি। আর দুটো স্টপ পরেই আমার বউ উঠবে বাসে। দেখবি শুধু।"

"বউ!" আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। বলে কী ছেলেটা!

শরথ বলেছিল, "দেখ না। তবে লোভ দিবি না। আমার বউ কিন্তু তোর বউদি।"

আমি অবাক হয়ে অপেক্ষা করেছিলাম। আর ঠিক দুটো স্টপ পরেই উঠেছিল মেয়েটা। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। সোনালি চুলের একটা মেয়ে। খুবই সুন্দর দেখতে। মেয়েটা বাসে উঠেছিল অত্যন্ত ধীরে। কারণটা বুঝেছিলাম ওকে পুরোটা দেখার পরে। মেয়েটার হাতে একটা লাঠি। মেয়েটা অন্ধ!

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছিলাম মেয়েটাকে। বাসটা মোটামুটি ফাঁকাই ছিল। তবু মেয়েটা সামনের দিকে না বসে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে হেসে বলল, "হাই শরথ!"

শরথ আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করে মেয়েটাকে বলেছিল, "হাই টিফানি! মিট মাই ফ্রেন্ড রিয়ান। হি ইজ নিউ ইন ডালাস।"

মেয়েটি আলগোছে হাত বাড়িয়েছিল আমার দিকে। আমি হাতটা ধরে 'হাই' বলেছিলাম।

মেয়েটি এবার পিছনের সিটের দিকে যাওয়ার আগে শরথের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "হ্যাভ আ নাইস ডে। সি-ইয়া।"

শরথ বলেছিল, "দেখলি!"

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না।

শরথ বলেছিল, "দারুণ মেয়ে। একদিন ওকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাব।"

আমি বিরক্ত হয়ে তাকিয়েছিলাম, "সিরিয়াসলি!"

আমাদের ইউনিভার্সিটিটা বেশ বড়। কিন্তু কোনও পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ডিফাইন করা নেই। আমি গতকালই জেনে নিয়েছিলাম যে, আমার ক্লাস ডালাস হলের ডেডম্যান কলেজে হবে।

ডালাস হলটা খুব সুন্দর একটা বিল্ডিং। মাথার উপর বড় ডোম আর সামনে রোমান স্থাপত্যের মতো বড় পিলার দেওয়া বাড়িটা দেখলেই সম্ভ্রম জাগে। ডালাস হলের সামনেই বড় লন। তাতে অনেক রাস্তা ক্রিসক্রস করে গেছে। আর রাস্তাগুলোর ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টে একটা বড় ফোয়ারা বসানো। ফোয়ারার চারদিকে চারটে বেঞ্চও আছে।

গতকালই ওখানে গিয়েছিলাম। আজ তাই তিনতে অসুবিধে হয়নি। তিনটে ঘোড়া, বা থ্রি মাসস্ট্যাঙের মূর্তির সামনে থেকে শরথ নিজের ক্লাসের দিকে যেতে-যেতে বলেছিল, "ফেরার সময়ও কিন্তু বাস পেয়ে যাবি। হাঁটিস না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেডম্যান কলেজের একটা বড় হল ঘরে আমাদের ওরিয়েন্টেশন ছিল। আমি গিয়ে দেখেছিলাম নানিয়া এসে গিয়েছে। মুখটা গম্ভীর। আমি অতটা পাত্তা না দিয়ে চারিদিকে তাকিয়েছিলাম। ক্লাসরুমটা সুন্দর। পরিষ্কার। ছড়িয়ে ছিটিয়ে জনা পনেরোজন বসে রয়েছে। তার মধ্যে আমিই একমাত্র বাঙালি। বাকিদের মধ্যে নানিয়া ছাড়াও বসে রয়েছে বেশ কিছু চাইনিজ ছাত্র। দু'-তিন জন আমেরিকান আর কয়েকজন দক্ষিণ আমেরিকার ছাত্র। এর মধ্যে কয়েকজনের বয়স তো প্রায় ফিফ্টি! একজন আমেরিকান ভদ্রলোকের বয়স তো নিশ্চিতভাবে পঞ্চাশ হবেই!

আমি চুপ করে বসে আমার ল্যাপটপটা খুলেছিলাম। নানিয়া নিজেই এসে বসেছিল আমার পাশে। তারপর কনুই দিয়ে ঠেলে বলেছিল, "কেয়া হুয়া দিখাই নেহি দে রাহা হ্যায় মুখে!"

আমি বলেছিলাম, "দিখাই তো দিচ্ছে ম্যাডাম। কিন্তু টেম্পারেচার দেখে কাছে যেতে ভয় লাগছে।"

নানিয়া বলেছিল, "আরে পুছো মত!"

আমি ল্যাপটপের দিকে চোখ রেখে বলেছিলাম, "নহি পুছতা।"

"আরে," নানিয়া রেগে গিয়েছিল, "বাড়িতে বাবা, এখানে তুই। কী পেয়েছিস তোরা?"

আমি হেসে বলেছিলাম, "ব্যাপারটা কী?"

নানিয়া বলেছিল, "আমি কি বাচ্চা নাকি? এখনও বেবি সিটিং করে চলেছে। তোর বাড়ির কাছেই আমি একটা অ্যাপার্টমেন্ট দেখেছি। ওই অ্যামসবেরি ড্রাইভেই। বলনাম, ওখানে শিফ্‌ট করি, বাবা বলে, না এখন যেখানে আছি সেখানেই থাকতে হবে। কাছেই আমার পিসির বাড়ি। পিসি না কি আমার খেয়াল রাখবে! আবে ম্যায় বচ্চি হু কেয়া?"

আমি বলেছিলাম, "বাবা যাচ্ছে কবে?"

নানিয়া বলেছিল, "কাল।"

"পরশু শিফ্‌ট কর," আমি হেসেছিলাম, "বেকার টেনশন মিচ্ছিস কেন?"

নানিয়া চোয়াল শক্ত করে বলেছিল, "জানিস তো না! এরা সব বড়-বড় চাকরিই করেছে শুধু! সারা জীবন বিদেশেই ঘুরেছে। কিন্তু মনটা বড় হয়নি! আদর্শ আর সংস্কারের নামে শুধু মেয়েদের উপর জুলুম করছে। বাড়ি তো নয় যেন হিপ্পি সিরিয়াল চলছে!"

আমি কথা ঘোরাতে বলেছিলাম, "আমায় একটা মোবাইল নিতে হবে। কী করি বলতো?"

নানিয়া বলেছিল, "এখান থেকে বেরোবার সময় বলবি। যাব তোকে নিয়ে। সামনেই এটি অ্যান্ড টি-র স্টোর আছে। শ'দুয়েক ডলারের ভিতর হয়ে যাবে। টাকা আছে, না আমি দেব?"

আমি তাকিয়েছিলাম নানিয়ার দিকে। রাজি এমন বলত না? না, রাজি বলত না। কিনে এনেই হাজির করত। তারপর ঢাকা করলে টাকা নিত। কোথা থেকে যে মেয়েটা টাকা পেত কে জানে! এখানে আসার পর আর কখা হয়নি রাজির সঙ্গে। কেমন আছে ও! তারপরেই মনে হয়েছিল, কেমন আর থাকবে, ভালই আছে!

ওরিয়েন্টেশন চলেছিল ঘণ্টাখানেক ধরে। তাতে এখানকার সম্বন্ধে বলা হয়েছিল আমাদের। কোর্স কেমন। কতটা পড়াশোনা করতে হবে। পরীক্ষার প্যাটার্ন কী। এসবই বলা হয়েছিল। তার সঙ্গে কী-কী ফেসিলিটি আমরা পাব। কার সঙ্গে কথা বলতে পারি। প্রফেসররা কীভাবে আমাদের হেল্প করবেন, এসবও বলা হয়েছিল। আর সব শেষে বলা হয়েছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা। এক বছরের শেষে একটা পরীক্ষা হবে। আর সেটায় পাশ না করতে পারলে একদম তল্পিতল্পা সমেত বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে আমাদের।

এটা শুনে আমার ভিতরটা কেঁপে গিয়েছিল একদম। বাড়ি পাঠিয়ে দেবে! আমি এখানে আসার আগে বুঝেছিলাম যে ইকোনমিক্স নিয়ে আমার দেশে আমি যা পড়েছিলাম সেটার চেয়ে এখানের কোর্স অনেক আলাদা। পড়াশোনার ধরনও আলাদা। তাই আসার আগে অঙ্ক আর স্ট্যাটিসটিক্সের উপর আমি খুব জোর দিয়েছিলাম। এখানে ওরিয়েন্টেশনে কথা শুনে বুঝেছি যে, আরও জোর দিতে হবে। কারণ আমার মতো ছাত্ররা পিছিয়ে আছে অনেক। তাই ওই পরীক্ষায় পাশ করতে গেলে আমায় খাটতে হবে খুব।

ওরিয়েন্টেশন শেষে আমাদের জন্য খাবারের বন্দোবস্ত ছিল। সেখানেই টুকটাক কথা হচ্ছিল সবার সঙ্গে। দেখেছিলাম চাইনিজ ছাত্ররা খুব একটা গল্প করতে বা কথা বলতে আগ্রহী নয়। তবে ওই বছর পঞ্চাশোর্ধ্ব ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হয়েছে। লোকটির নাম টম প্রো। ভদ্রলোকের বিক্কনেস আছে। এখন উনি একটা পিএইচ ডি ডিগ্রি পেতে চান। সারা জীবন ব্যাজের পর ব্যবসা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যে, ওঁকে আর ব্যবসা সেভাবে না দেখলেও হয়। এত বছর পরে উনি নিজের মতো পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছেন। তাই এসএমইউ-তে ভর্তি হয়েছেন। উনি নিজের থেকেই আমায় মোবাইল নাম্বার দিয়েছিলেন। আমি অবাক হয়েছিলাম খুব। এমন তো হয় না!

ফেরার পথে নানিয়ার সঙ্গে গিয়েছিলাম মোবাইল ক্যানেকশন নিতে। সেখানেও বিশেষ সময় লাগেনি। আসলে এখানে এসে ন্যূনতম জিনিসগুলো জোগাড় করতেই প্রথমে কয়েকটা দিন চলে যায়।

মোবাইলটা খুব একটা দামি না হলেও বোঝাও নয়। স্মার্ট ফোন। এখানে সবকিছুই ইমেল নির্ভর। আমাদের দেশে যেমন আমরা টেক্সট করি বা হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ রাখি এখানে তেমনই ইমেল। তাই এমন একটা ফোন থাকা জরুরি যাতে মেলটা সহজে দেখা যাবে।

আমি নানিয়াকে থ্যাঙ্কস জানিয়ে বাড়ির পথ ধরব ভেবেছিলাম। কিন্তু নানিয়া ছাড়েনি। বলেছিল, "বাড়ি যাবি? এখনই?"

"তবে কোথায় যাব?" আমি অবাক হয়েছিলাম।

নানিয়া বলেছিল, "তেরা ও বোরিং সা ঘর মে রাখ্‌না কেয়া হ্যায়? এর পরে পড়াশোনার চাপ বাড়বে খুব। গাণ্ড ফাটনি হি হ্যায় বাদ মে! চল কিছু খাই।"

আমি বলেছিলাম, "দুপুরেই তো খেলাম। কলেজেই তো খাবার ছিল।"

"আঃ, চল না," নানিয়া রীতিমতো আমার হাত ধরে টানছিল।

আমার ভয় লেগেছিল খুব। শুনেছি এখানে বাইরে খাওয়া খুব খরচসাপেক্ষ। এখনও ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার হয়নি। বাড়ি থেকে হাজার ডলার নিয়ে এসেছিলাম। সেটাই খুব টিপে খরচ করছি। কিন্তু তাও ন্যূনতম জিনিসগুলো কিনতে প্রায় শ'চারেক ডলার বেরিয়ে গিয়েছে! আমি ঢোক গিলে দাঁড়িয়েছিলাম।

"তু বান্দা বহত বোরিং হ্যায়। আই উইল টিচ ইউ নাউ! চল। বাবা আছে। আমায় ভালই টাকা দিয়ে রেখেছে!" নানিয়া নিজের ডেবিট কার্ডটা দেখিয়েছিল, "আমি তোর মতো স্কলারশিপে পড়তে আসিনি। সামঝা?"

আমি কী বলব বুঝতে পারিনি। আমার মধ্যবিত্ত বাঙালি মন একটু ধাক্কা খেয়েছিল। মেল ইগোও বোধ হয় টাল খেয়েছিল একটু। একটা মেয়ে এভাবে আমার দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে! তারপর ভেবেছিলাম, এসব পনেরোশো শতাব্দীর মানসিকতা নিয়ে ভেবে লাভ নেই।

নানিয়া আমাকে একটা চিপোটল-এ নিয়ে গিয়েছিল। ছিমছাম খাবারের জায়গা। একটা লম্বা কাউন্টার। এক পাশে টাকা নেওয়া হচ্ছে। কাউন্টারের মাথার উপরের লাল রংয়ের মেনু বোর্ড ঝুলছে। এক পাশে চেয়ার টেবলও রাখা। অন্য পাশে ফাউন্টেন আছে সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের জন্য।

নানিয়া বলল, "এটা মেক্সিকান গ্রিল। নাম করা রেস্টুরেন্ট চেন। ট্যাকো অর্ডার করি?"

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়েছিলাম।

নানিয়াই সমস্তটা সামলে খাবার হাতে করে এনে রেখেছিল সামনে। বলেছিল, "খেয়ে নে। রাতে রান্না করবি?"

"কেন?"

"এখান থেকে কিছু প্যাক করে দেব?" নানিয়া জিজ্ঞেস করেছিল!

আমি অবাক হয়েছিলাম। তারপর বলেছিলাম, "না, না, কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছিস?"

নানিয়া হেসেছিল একটু। তারপর বলেছিল, "আসলে আমার একটা হেল্প লাগবে তোর।"

আচ্ছা! এবার বুঝেছিলাম নানিয়ার এমন দয়ার সাগর হওয়ার পিছনের কারণটা। আগেই খাইয়ে দাইয়ে ফিট করে নেওয়া হচ্ছে! যাতে পরে কাজটা করব না বলতে না পারি।

আমি শান্ত গলায় বলেছিলাম, "একটা সফটড্রিঙ্ক নে। আর বাড়ির জন্য বুরিটো প্যাক করে দিস।"

"শালে!" টেবলের তলা দিয়ে আমার পায়ে আলতো করে লাথি মেরেছিল নানিয়া। তারপর বলেছিল, "তুই ঠিক বলেছিস, আমায় ওই পিসিদের বাড়ি কাছের অ্যাপার্টমেন্টেই থাকতে হবে। কিন্তু সুরির সঙ্গে দেখা করব কী করে?"

"সুরি?" আমি খাবার ভর্তি মুখ নিয়ে অবাক হয়েছিলাম।

নানিয়া খাবারটা ছুঁয়েও দেখেনি। বরং আগ্রহ ভরে বলেছিল, "সুরিদের চাচ্চা। দিল্লির ছেলে। আমার সঙ্গে খুব ভাব। মানে উই আর ইন লাভ। তা যদি তোর ওখানে আমরা মিট করি!"

"ও এখানে থাকে?"

"ডালাস এখন বুমিং জানিস তো! এখানেই একটা সফটওয়্যার ফার্মে আছে সুরি। ওর জন্যেই তো এসএমইউ-তে পড়তে এসেছি। প্লিজ ইয়ার।"

আমার ঘড়িটা দেখলাম আবার। একটু আগে ফোন করেছিলাম নানিয়াকে। ও গাড়ি নিয়ে আসছে। আমায় তুলে সামুদার বাড়িতে যাবে। এত দেরি হচ্ছে কেন কে জানে! আমি আর একবার মোবাইলটা দেখলাম। মা ফোনটা ধরল না কেন!

গতকাল খাবার দোকান থেকে বেরিয়ে আমি বাড়ি চলে এসেছিলাম। নানিয়া যাওয়ার আগে শুধু বলেছিল, "থ্যাঙ্কস রিয়ান। ইউ আর অ্যা ডার্লিং। বাবা এই ক'দিনেই তোকে খুব বিশ্বাস করে ফেলেছে। সুরি খুব খুশি হবে।"

আমি উঠে আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। অন্ধকার। জনমনিষ্যি নেই! তারপর মুখ ফিরিয়ে ঘড়ি কাম ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ গেল। আর হঠাৎ কেমন একটা লাগল আমার। মনে হল এখানে যদি আমি এখন মরেও যাই কেউ তো জানতে পারবে না। আমার যদি বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে বাড়িও ফিরতে পারব না! হঠাৎ মনে হল কে যেন আমার হাত-পা সব বেঁধে দিয়েছে। মনে হল বুকের ভিতর কেমন যেন একটা খালি টিন ঢুকে বসে রয়েছে। আমি নিজেই তো আসতে চেয়েছিলাম এখানে। অনেক বড় হতে হবে আমায়। অনেক নাম করতে হবে। অনেক টাকা রোজগার করতে হবে, এসবই তো লক্ষ্য ছিল। সেই ক্লাস এইট থেকে তো এটাকেই পাখির চোখ করে নিয়েছি। তবে কেন এখন এমন লাগছে! আচ্ছা আজ ওই বিনটা বলেই কি! এতক্ষণ তো মনে করব না বলে নানা কিছু ভাবলাম! কিন্তু কেন তাও বারবার মনে পড়ছে!

আচমকা আমার কান গরম হয়ে উঠল। চোখ ঝাপসা হয়ে গেল! মনে হল কে যেন গলার কাছটা চেপে ধরেছে আমার! আমি দ্রুত ঘরের লাগোয়া বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিলাম। কত চেষ্টা করি যাতে ওই কথাটা মনে না আসে, কিন্তু সমস্তের একটু ফাঁক পেলেই ঠিক মনের ভিতর মাথা তুলবে কথাটা। আমি জোর করে মনটা ঘোরাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু বারবার সেই সকালটা ছোট-ছোট দৃশ্যের আকারে ছিটকে উঠছে চোখের সামনে। মনে পড়ে যাচ্ছে সেই সব কথাগুলো! মায়ের সেই ভাঙাচোরা মুখটা যেন এত দূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে খুলে যাওয়া একটা হোটেল রুমের দরজা!

আমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে তোয়ালেতে মুখটা মুছলাম। সত্যি, মানুষের মন কীরকম যেন। এই মুহূর্তে একরকম আর পরের মুহূর্তেই অন্যরকম!

"সরি, সরি, লেট হো গ্যায়া।"

আমি পিছন থেকে নানিয়ার স্বরটা পেয়ে মুখ ঘোরালাম। ও কখন এল?

"শরথ বাইরে যাচ্ছিল। দরজায় তাই নক করতে হয়নি," কথাটা শেষ করেই নানিয়া থমকে গেল, "তোর কী হয়েছে? মুখ-চোখ এমন লাল কেন?"

আমি নিজেকে স্বাভাবিক করতে বললাম, "না কিছু নয়। এমনি।"

"ও," নানিয়া বুঝল এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।

"চল তা হলে। তোর দাদার বাড়ি যেতে তো আধঘণ্টা সময় লাগবে। যেতে পারবি তো?"

শেষের প্রশ্নটা সাবধানে রাখল নানিয়া।

আমি চুলটা আঁচড়ে "চল," বলে এগিয়ে গেলাম। নানিয়া ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। আমি আলোটা নিভিয়ে দরজাটা বন্ধ করার জন্য টানলাম। তাও শেষ মুহূর্তে আবার চোখ পড়ল নীলচে আলো-জ্বলা ঘড়ি কাম ক্যালেন্ডারটা। আঠেরোই আগস্ট! বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল আবার। এগারো বছর হয়ে গেছে তবু আজও বাবার মৃত্যুদিনটা আমায় ভিতরে-ভিতরে একই রকমভাবে মেরে ফেলে!

পাঁচ

রাজিতা

ছোটবেলায় বাবার ঘরের পাখাটাকে ভাবতাম ভীমের গদা। অবিকল একই রকম দেখতে। যখন সুইচ অন করা হয়, একটা ঘটাং শব্দ দিয়ে পাখাটা ঘোরা শুরু করে।

আজও সেই শব্দ দিয়েই পাখাটা ঘোরা শুরু করল। এতক্ষণ ওটা বন্ধ ছিল। আমি বাবাকে নিয়ে গিয়েছিলাম খাবার ঘরে। বাবার একা হাঁটতে কষ্ট হয়। আজকাল। ভাই তো সকালে ঘুমোয়। আর মা নিজেই হাঁটু নিয়ে কষ্টে। তাই আমি যতক্ষণ বাড়িতে থাকি বাবার সব কাজ করে দেওয়ার চেষ্টা করি।

বাবা কেমন যেন থতমত খেয়ে গিয়েছে। বিশেষ কথা বলে না। খেতে চায় না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। আর চোখের কোণ দিয়ে জল পড়ে! আমার সুস্থ-সবল বাবা এক মুহূর্তের মধ্যে কীভাবে যে এমন হয়ে গেল সেটা ভেবেই আমি অবাক হয়ে যাই!

সকালে পড়িয়ে ফিরে আমি বাবাকে ধরে-ধরে খাবার জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিলাম। মা সামনে দুধ আর খই দিয়ে গিয়েছিল। আমি ভাল করে দুটো মেখে চামচ দিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলাম বাবাকে। বাবা খাচ্ছিল, কিন্তু জোর করে। যেন ইচ্ছে নেই। এমন একটা ভাব। আর খেতে-খেতে আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল বাবরাব।

আমি বলেছিলাম, "বাবা কিছু বলবে?"

বাবা জড়িয়ে বলেছিল, "আমি কেমন অপদার্থ, না?"

"আবার বাজে কথা শুরু হল!" আমি সামান্য ধমক দিয়েছিলাম, "কেন এসব বলছ? মানুষের শরীর খারাপ হয় না? হয় তো!"

বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গিয়েছিল।

আমি খাবারটা খাইয়ে বাবাকে ধরে-ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম বেসিনের কাছে। মুখ ধুইয়ে, মুছিয়ে তারপর এই আবার নিয়ে এসেছি ঘরে।

বাবা বিছানায় হেলান দিয়ে ঘরে বসে বাইরের দিকে তাকাল। দোতলার এই ঘরটা থেকে পাশের বাড়ির শ্যাওলা ধরা ইটের দেওয়াল দেখা যায়। এখানে সবটাই বহু পুরনো বাড়িঘর। দেখার কিছুই নেই। শুধু ইটের দেওয়াল। কালো হয়ে যাওয়া শ্যাওলা। এদিক ওদিক থেকে বেরিয়ে আসা অশ্বত্থ চারা, নয়নতারার ডাল! তাও ওই দিকে তাকিয়ে বাবা কী দেখে কে জানে!

আমি বললাম, "বাবা একটু শোবে না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অ্যাঁ!" বাবা তাকাল আমার দিকে।

পাঁচ বছরের বাচ্চা হয়ে গিয়েছে বাবা!

আমি বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, "কাল রাতে তো ভাল করে ঘুমোওনি। একটু শোও। পারলে ঘুমিয়ে নাও।"

"ঘুমোব?" বাবা জিজ্ঞেস করল।

ওই জিজ্ঞেস করার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যে, আমার চোখে জল চলে এল। এই মানুষটা সারা জীবন তুলোর মতো করে আমায় রাখার চেষ্টা করেছে। শরীর খারাপ হলেও সারা রাত মাথার কাছে বসে থেকেছে। পরীক্ষার সময় সব সময় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে। কখনও আমায় একা হতে দেয়নি। আজ সেই মানুষটাকে এমনভাবে দেখে আমার বুকের ভিতরটা ঝুপ ঝুপ করে ভেঙে পড়ল!

বাবা আস্তে-আস্তে শুয়ে পড়ল এবার। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। দেখলাম দু'মিনিটের মধ্যেই চোখ বন্ধ হয়ে গেল। আমি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম বাবার দিকে। এই দু'সপ্তাহে কেমন যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গিয়েছে মানুষটা। আবার চোখে জল এল। বাবা এমন হয়ে যাবে আমি ভাবতেই পারিনি। আমার জীবনের সুপারম্যান আমার বাবা!

বাবার অল্প বয়সেই ঠাকুরদা মারা যান। আর মৃত্যুর সময় ঠাকুরদা এই বাড়িটা ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারেননি। এক সময় নাকি আমাদের অনেক টাকা-পয়সা ছিল। আমাদের এক পূর্বপুরুষ ব্রিটিশদের সঙ্গে ব্যবসা করে অনেক টাকা করেছিলেন। সেই টাকায় কলকাতায় চারটে বাড়ি আর বর্ধমানে অনেক জমিজমা কিনেছিলেন। কালের গতিতে সেসব আর কিছুই নেই। তাঁর বংশধরেরা সেই সব কিছুই উড়িয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে। শুধু এই দুটো বাড়ি পড়েছিল শেষমেশ। যা আমাদের হাতে এসে পড়েছে।

বাবা তাই বিশেষ কিছু পায়নি ছোট থেকে। বুড়ো কঙ্কদপের মতো এই বাড়িটার অংশ ছাড়া বাবা আর জেঠুর কিছুই ছিল না।

বাবা আর জেঠু দিনের বেলা নানা কাজ করে নাইট কলেজে পড়াশোনা করেছে। আর সেইসব কাজের মধ্যে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ধুপকাঠি বিক্রি করা থেকে বাসের কন্ডাক্টরের চাকরি, সব ছিল। পরে কলেজ পাশ করে বাবা লিলুয়ার এই ফ্যাক্টরিতে কাজ পায়। তারপর তড়দিনে পুলিশে চাকরি পেয়ে গিয়েছিল।

তারপর থেকে সেই সর্বস্বাসী অভাবটা আর ভোগ করতে হয়নি, কিন্তু ত্যাগ হিসেবের বাইরেও যেতে পারেনি। সারাক্ষণ 'মাসের শেষ' নামক ভয় আমাদের তাড়া করেছে।

কিন্তু এবার মনে হয় সেই পুরনো দিনগুলো আবার ফিরে আসবে। আজকাল মনে হয় কালো একটা ছায়া ক্রমশ ঘিরে ধরছে আমাদের বাড়িটাকে। প্রথমে রিয়ান চলে গেল তারপর বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমার জীবনের প্রিয় দু'জনই কেমন যেন পিছলে গেল হাতের থেকে!

পিছলে কি গেল সত্যি! আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম একটু। আজ শনিবার। ভাবছি বাড়িতেই থাকব। সুজাতাদির কাছে গানের ক্লাস নেই আজ। তা ছাড়া চাকরির জন্য এদিক ওদিক যাওয়ার কিছু নেই। যে কটা জায়গায় সিভি ফেলা আছে তারা হয়তো এবার আমাকে দেখলেই পুলিশে খবর দেবে!

শুধু একজন ভত্তলোকের কাছে যাওয়ার আছে। সাগর সামন্ত নাম ভত্তলোকের। উনি বলেছেন গানের সিডি বের করার বন্দোবস্ত করে দেবে। এমনকী কিছু প্রোগ্রামও জোগাড় করে দেবেন।

জানি এটা শুনলে সুজাতাদি রাগ করবে। আসলে সুজাতাদি অনেক প্রোগ্রাম করে। সেখানে আমাকেও নিয়ে যায়। টুকটাক গানও করায়। কিন্তু আমি চাইছি নিজে কিছু করতে। সুজাতাদির ওই প্রোগ্রামগুলোতে এমনিই গান করি। টাকা-পয়সা কিছু পাই না। কিন্তু আমার এখন টাকার দরকার। দেখি সাগর সামন্ত যদি কিছু করে দিতে পারেন!

জুডো ঘুমোচ্ছে এখনও। ছেলেটা কোন রাত জাগে কে জানে!

আমি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালাম। মাথার উপর সাঁকো দেখা যাচ্ছে। জং ধরা ভাঙাচোরা ছোট্ট ব্রিজ একটা। শুনেছি এক সময় আমাদের বাড়ির সঙ্গে সামনের বাড়ির খুব দহরম-মহরম ছিল। তখন খুব ব্যবহার করা হত সাঁকোটা। এ বাড়ি ও বাড়ি যাতায়াত চলত খুব। ক্রমশ সবই ছানা কেটে গিয়েছে। দু'বাড়ির যাতায়াত বন্ধ হয়েছে। রোদে-জলে-ঝড়ে একা পড়ে থাকতে-থাকতে এই সাঁকো অভিমানী আর একলা হয়ে পড়েছে। জং লেগে তার মন ভেঙে গিয়েছে।

হঠাৎ বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। আমাদের সাঁকোটাও যদি এমন ভেঙে যায়! রিয়ান কত দিন হল গিয়েছে একবারও তো যোগাযোগ করেনি! আমি ইমেল করেছিলাম। উত্তর দেয়নি। তবে কি আর ও যোগাযোগ রাখতে চায় না? আমার নিজের গালে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করল! এত বছর চুপ করে রইলাম, আর কেন ও চলে যাওয়ার দিন ওই কাজটা করতে গেলাম! আমি রিয়ানকে আমার থেকে দূরে ঠেলে দিলাম!

মন এক অদ্ভুত জিনিস! যা ভাবলে আমাদের কষ্ট হবে সেগুলোই যেন বারবার আমাদের সামনে নিয়ে আসে আমাদের মন। যে স্মৃতি সবচেয়ে বেশি ক্ষত তৈরি করে সেগুলোই যেন বারবার চোখের সামনে সিনেমার মতো তুলে আনে। আমার মনে হয় আমরাই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু! আমরা যেন নিজেরাই চাই না নিজেদের ভাল রাখতে! সারাক্ষণ ফেসবুকে হাজার-হাজার ইন্সপিরেশনাল কোটেশন পড়লেও আমরা নিজেরাই নিজের অজান্তে বেঁকে যাই কষ্টের দিকে! এর থেকে কি কোনও গুপ্ত আনন্দ পাই আমরা? কষ্ট পেতে কি সত্যি আনন্দ লাগে আমাদের? নিজেদের সঙ্গে কিসের এত শত্রুতা! আমরা আমাদের কোন পাকা ধানে মই দিয়েছি?

আমি জোর করে মনটা ঘোরাবার জন্য অন্য কিছু ভাবার চেষ্টা করলাম। চোখ তুলে দেখলাম সামনের বাড়ির তিনতলায় ঠাকুরমা এসে বসেছে একটা কাঠের চেয়ারে। আমার হঠাৎ ইচ্ছে হল ঠাকুরমার কাছে যেতে। যেভাবে ছোটবেলায় দৌড়ে গিয়ে ঠাকুরমার ওই লোতলার মতো উঁচু খাটটায় উঠে পড়তাম, সেভাবেই আবার উঠে পড়তে ইচ্ছে করছে। কোনো সিঁড়ি গুঁজে দিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, "সুড়সুড়ি দাও!"

কিন্তু ঠাকুরমা আমার দিকে তাকাচ্ছে না! আজকাল ঠাকুরমা কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। সারাক্ষণ কাচের চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে অজানা কোনও দিকে। ভাবলাম, আজ একবার ঠাকুরমার কাছে যাব। বাবার খবরটা দিয়ে আসব। জানি না ওদের বাড়ির বাকিরা খবরটা দিয়েছে কি না ঠাকুরমাকে।

আমার এখনও সেদিনের কথা মনে পড়লে বুক কেঁপে ওঠে! ওই শোভাবাজার থেকে কি বললেই হট্ট করে লিলুয়া পৌঁছে যাওয়া যায়! আমি বুঝতেই পারছিলাম না কী করব! আমার যেন সব দিক গুলিয়ে গিয়েছিল! আমি তো কোনও দিন যাইনি লিলুয়া। বাবার ফ্যাক্টরি যাইনি। কী করে খুঁজে পাব? ফোনে শোনা নার্সিংহোমের নামটাও যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল টেনশনে। ভাবছিলাম মাকে কি এখন জানাব, না পরে! আমি ঠিক করতে পারছিলাম না কী করব! আসলে সংসারের সব তো বাবাই সামলায়! এখন সেই লোকটার কী হয়েছে!

আমি ব্যাগ খুলে দেখেছিলাম কত টাকা আছে। বেশি নেই। ট্যাক্সি করা যাবে না। আমি বাসের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। হাওড়া স্টেশন যেতে হবে। টাকা কী যে গুরুত্বপূর্ণ একটা বস্তু তা আমি সেদিন যেন আরও বুঝতে পারছিলাম। আমার মাথার থেকে পুরো বেরিয়ে গিয়েছিল ওই ভবানীপুরের ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারটা।

বাসে উঠে কোনও মতে পৌঁছেছিলাম হাওড়ায়। মাথাটা ঘুরছিল। টেনশনে হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। ভাবছিলাম, আজ যদি রিয়ান থাকত তবে তো ওকেই ডাকতাম। আমার যে আর কাউকে ডাকার নেই!

হাওড়া থেকে লিলুয়া যেতে সময় লাগেনি। আমি স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা রিকশা ধরেছিলাম। ড্রিমল্যান্ড নার্সিংহোম বলতেই রিকশাচালক বলেছিল চেনে।

আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল ভয়ে। খালি ভাবছিলাম কী দেখব গিয়ে?

ড্রিমল্যান্ড নার্সিংহোমটা ছোট। দেখে মনে হয়েছিল সদ্য তৈরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে। আমি সিঁড়িতে পা দিয়েই নতুন রঙের গন্ধ পেয়েছিলাম। জানালার ফ্রেমে কোথাও-কোথাও এখনও প্লাস্টিক লেগে রয়েছে।

দরজা দিয়ে ঢুকেই রিসেপশনিস্ট আর তার এক পাশে লম্বা করে বসার জায়গা। আমায় হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে দেখে চেয়ারে বসে থাকা তিন-চারজন উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এসেছিল আমার দিকে।

"আপনি রজতদার মেয়ে?" মাঝবয়সি সামান্য বেঁটে একজন জিজ্ঞেস করেছিল আমায়।

"হ্যাঁ! বাবা কেমন আছে? কী হয়েছে?"

লোকটি হাত জোড় করে নমস্কার করে বলেছিল, "নমস্কার আমি অনিল রায়। রজতদার সঙ্গেই কাজ করি। আসলে আজ খুব সমস্যা হয়েছে। নিজে দেখেননি?"

আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, "কী হয়েছে বাবার?"

"রজতদার সেরেব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। আইসিসিইউ-তে আছে। তবে আউট অফ ডেঞ্জার।"

"সে কী!" আমার মনে হয়েছিল পা দুটো নরম মাটির তৈরি। মনে হয়েছিল এবার পড়ে যাব।

অনিলবাবু বলেছিলেন, "চিন্তা করবেন না। লাইফ রিস্ক নেই। আসলে খুব শক পেয়েছেন তো!"

"কেন? কী হয়েছে?"

এবার অনিলবাবুর পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোক বলেছিলেন, "আসলে আমাদের ফ্যাক্টরি লক-আউট হয়ে গেছে আজ। গত মাস দুয়েক ধরেই লেট হচ্ছিল মাইনে দিতে। আজ সকালে এসে দেখি ফ্যাক্টরি গেটে তালা ঝুলছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে ফ্যাক্টরি। মেন গেটের সামনে মালিকের পোষা কিছু গুন্ডা ছিল। আমরা অ্যাক্টিভেশন দেখাতেই তারা হামলা করে। খুব ঝামেলা হয়েছে। পুলিশ, প্রেস সব এসেছিল। তার মধ্যেই একটা হুলিগান এসে রজতদার কলার ধরে গালে থাপ্পড় মেরেছিল। তারপরেই রজতদা জানি কেমন হয়ে যায়। মাটিতে পড়ে যায়। ঘামতে থাকে। আমরা সঙ্গে-সঙ্গে এখানে নিয়ে এসেছি।"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে ওই সিটে বসে পড়েছিলাম।

অনিলবাবু পাশে বসে বলেছিলেন, "আপনি শক্ত হোন। সব ঠিক হয়ে যাবে। এখানে দু'দিন রেখে তারপর কলকাতায় বাড়ির দিকে কোনও হাসপাতালে শিফ্‌ট করে নিয়ে যাবেন। এখন হাজার পাঁচেক জমা দিতে হবে।"

আমি কী বলব বুঝতে পারিনি। অত টাকা আমি পাব কোথায় এখন?

অনিলবাবু আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বলেছিলেন, "আমরা জমা করিয়ে দেব আজ। জোগাড় করতে লোক পাঠিয়েছি। জাস্ট বললাম আপনাকে। আপনি কাল-পরশু মিটিয়ে দেবেন। তবেই হবে।"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "বাবাকে দেখব।"

"আসুন। আমি পারমিশন করিয়ে নিয়েছি। আইসিসিইউ-তে আছে তো। ভিতরে যেতে দেবে না। আপনি বাইরের থেকে মানে কাচের এপার থেকে দেখবেন।"

আমি অনিলবাবুর সঙ্গে গিয়েছিলাম দোতলায়। লিফ্‌ট আছে। কিন্তু শুধু রোগীদের জন্য। আমরা হেঁটেই উঠেছিলাম উপরে। একটা কাঠের বড় দরজা। বাইরে লেখা 'আইসিসিইউ'। জুতো খোলার নোটিস টাঙানো।

আমরা জুতো খুলে কাঠের দরজা ঠেলে ঢুকেছিলাম ভিতরে। ভিতরটা ঠান্ডা। ওষুধের গন্ধে চোবানো। সামনে আর-একটা কাঠের পার্টিশন। আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম।

বাবা শুয়েছিল একটা পরদা দিয়ে আলাদা করা বিছানায়। চোখ বন্ধ। স্যালাইন চলছে। মাথার কাছে মনিটর। আচমকা আমার সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। বুকের ভিতর যাবার আটকে যাওয়ার মতো কষ্ট হয়েছিল একটা। মনে হয়েছিল অক্সিজেন কমে গিয়েছে চারিপাশে।

"আপনি কাঁদবেন না," অনিলবাবু আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিলেন, "এমন তো হয় জীবনে। কত মানুষের হয়েছে। তারা সামলেছে, আপনিও পারবেন।"

আমি নীচে নেমে প্রথমেই জেঠুকে ফোন করেছিলাম। বলেছিলাম মাকে একটু বুঝিয়ে বলতে। জেঠু সঙ্গে-সঙ্গেই আসতে চেয়েছিল। আমি বারণ করেছিলাম। কারণ এখন তো কিছু করার নেই। পরের দিন টাকা নিয়ে তো আসতেই হবে। দেখা যাবে।

আমি বারান্দায় থেকে সরে এলাম। মেঘ করছে এখন। এবার বর্ষায় বৃষ্টি নেই তেমন। সারাক্ষণ একটা দম চাপা ভাব হাওয়ায়। এমন দিনগুলোয় আমার কেমন যেন লাগে! আগে এমন বেকার দিনগুলোয় আমি ভবানীপুর চলে যেতাম। রিয়ান থাকুক বা না-থাকুক ওর বাড়িতে যেতাম। কাকিমার সঙ্গে গল্প করতাম। রিয়ানের ঘরে ঢুকে ওর বিছানায় শুয়ে থাকতাম। গান চালিয়ে শুনতাম। বইপত্র গুছিয়ে দিতাম।

কাকিমা সব দেখত আর হাসত। বলত, "এখন থেকেই সব দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছিস? ও কিন্তু খুব স্বার্থপর রাজি, তোকে কষ্ট দেবে বলে দিলাম।"

আমি ভাবতাম না ওসব। কত ছোট থেকে ওকে দেখেছি। শুধু ওকেই দেখেছি। আর কারও দিকে কোনও দিনও চোখ যায়নি। ও কেন কষ্ট দেবে আমায়? ও তো বোধে আমি কত ভালবাসি ওকে! সব কি আর মুখে বলতে হয়!

রিয়ান বরাবর একটু চাপা স্বভাবের। একটু আনমনা। খেয়ালি ধরনের। দেখতেও খুব সুন্দর। ভাল গান করে। গিটার বাজায়। পড়াশোনাতেও খুব ভাল। ফলে একটু বড় হতেই দেখতাম মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই ওর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। আমি নিজে ওর ব্যাগে মেয়েদের লেখা চিঠি পেয়েছি। ওর মোবাইলে প্রেমের মেসেজ দেখেছি। কিন্তু কোনও দিন আমার হিংসে হয়নি। রাগ হয়নি। কারণ রিয়ান তো এসব পাত্তাই দিত না। নিজেই আমায় দেখাত আর বলত, "এদের থেকে দেখে নাও। আমি নেই? আর দেখ রাজি, কত বানান ভুল!"

আজও এখনও মনে আছে সেই ইলেভেন পড়ার সময় আমি আর রিয়ান এমন মেঘলা দিনগুলোয় ওদের বাড়ির বারান্দাতে বসে এইসব গল্প পড়তাম। আর হাসতাম। আর হাসতে-হাসতে হঠাৎ রিয়ান কেমন চুপ করে যেত। মনে হত এই তো ছেলেটা এখনি এখানে ছিল, আর এই নেই!

ওই সময়টা আমি কিছু বলতাম না ওকে। শুধু ওঁর গা ঘেষে বসে থাকতাম। ওকে দেখতাম। মনে পড়ত ক্লাস সেভেনের সেই পিউ ব্যানার্জির প্রশ্ন, "কিস করেছিস?"

আমার খুব ইচ্ছে করত ওই আনমনা হারিয়ে যাওয়া রিয়ানটাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে। ওর ওই ছোট্ট দুটো ঠোঁটকে আমার ঠোঁটের মধ্যে আঁকড়ে ধরতে। ইচ্ছে করত পিউকে জানাতে যে আমি চুমু খেয়েছি রিয়ানকে! মনে-মনে লক্ষবার!

রিয়ান বেশিক্ষণ বসত না। উঠে পড়ত। তারপর নিয়ে দাঁড়াত বারান্দার কিনারায়। বলত, "এক দিন জানিস, সব ছেড়ে আমি অনেক দূরে চলে যাব। কেউ আমায় আর খুঁজে পাবে না!"

রিয়ান ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমি আর ওকে খুঁজে পাচ্ছি না। এত দিন হয়ে গেল আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেনি ও। কাকিমার থেকে জেনেছি যে নতুন শহরে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে রিয়ান। খুব ব্যস্ত। শুনেছি নানিয়া বীলো নামে একটি পাঞ্জাবি মেয়ে নাকি ওকে খুব স্নেহ করছে। তার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়েছে।

কথাটা শোনার পর থেকেই বুঝেছি আমার বুকের মধ্যে বেশ কিছু মৌমাছি বাসা বেঁধেছে। আর ওই কথাটা মনে পড়লেই তারা আমার বুকে কুট কুট করে হুল বিঁধিয়ে দিচ্ছে!

"রাজি, তোর বাবা ঘুমিয়েছে?" আমি মায়ের প্রশ্নে পাশে তাকালাম। মাকে কেমন যেন লাগছে। ফরসা মুখটায় একটা মেঘলা ছায়া। চোখের তলায় কালি। এই ক'দিনেই মা ভাঙা জমিদার বাড়ির মতো হয়ে গিয়েছে।

আমি সেদিন লিলুয়া থেকে বাড়িতে ফিরে দেখেছিলাম মা জবুথবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে বসে রয়েছে। পাশে জেঠিমা বসে। কাকিমাও এসে গিয়েছে ভবানীপুর থেকে।

মা আমায় দেখেই হাউমাউ করে উঠে বলেছিল, "এ কী হল রাজি? আমাদের এ কীরকম সর্বনাশ হল! এবার কী হবে? আমাদের এবার কী হবে?"

ওই অবস্থায় আমার মায়ের জন্য কষ্ট হলেও কোথায় যেন একটা খারাপ লাগাও উঁকি দিয়েছিল সামান্য! মা এটা কী বলল! বাবার শরীর খারাপ। সেটার চেয়ে আমাদের কী হবে সেটা কি বড় হল! বাবা কি আমাদের শুধু সিকিউরিটি? আর কিছু কি নয়?

মা আরও কিছু বলছিল। কাঁদছিল। বিছানায় মাথা ঠুকছিল। জেঠিমা আর কাকিমা মাকে সামলাবার চেষ্টা করছিল। আমি কিছু না বলে চুপ করে সরে এসেছি বারান্দায়। আমাদের বারান্দাটা থেকে কিছুটা আকাশ দেখা যায়। আমি সেইদিকেই তাকিয়েছিলাম। ঘোলাটে লাগছিল সবটা। উজ্জ্বল কিছু গ্রহ-নক্ষত্র ছাড়া বাকি সবটাই কেমন যেন আউট অফ ফোকাস হয়ে যাওয়া ছবি। আমি ভাবছিলাম, বাবার অসুখ সারতে সময় লাগবে অনেক। ফ্যাক্টরি বন্ধ। তার মানে আমাকে আরও জোর দিয়ে খুঁজতে হবে কাজ! আর তখনই মনে পড়েছিল সুজাতাদির কথা। সেই আকাশ বাসুর কথা। পাকা চাকরিটা রাখা ছিল আমার জন্য। কিন্তু হল না! আমার কপাল! সুজাতাদি সকালে বলেছিল লেভেল টু কমপ্লিট! আসলে আমার খেলাটাই যে শুরু হয়নি সেটা বুঝতেই পারেনি!

দু'দিন পরে আমরা বাবাকে নিয়ে এসেছিলাম এদিকে। জেঠুর জানাশোনা ছিল তাই মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করতে অসুবিধে হয়নি। সেখান থেকে কয়েক দিন হল বাড়িতে এসেছে বাবা। সেরিব্রাল অ্যাটাকের ফলে ডান দিকটা একটু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ওষুধ চলছে। গতকাল থেকে ফিজিওথেরাপিও শুরু হয়েছে। আমি জানি নার্স রাখতে পারলে ভাল হয়, কিন্তু সম্ভব নয়। টাকায় কুলিয়ে উঠব না। আমি আর মা মিলেই সবটা করছি।

এর পাশাপাশি আমি আরও টিউশনের চেষ্টাও করছি। হাবিবুরদাকে বলেছি। চেনাশোনা আরও কয়েকজনকেও বলেছি। একজন বলেছে ক্লাস ইলেভেনে ইকোনমিক্স পড়াতে হবে এমন দু'-চারটে ছেলেমেয়ে জোগাড় করে একটা ব্যাচ করে দেবে। তাই পড়াব। চাকরি যখন হচ্ছে না, কিছু তো একটা করতে হবে! আমি জানি এই ক'দিনেই যা খরচ হয়ে গিয়েছে তাতে পরের মাস থেকেই ব্যাঙ্কের টাকায় হাত পড়বে। তার আগে যে করেই হোক আমায় কিছু একটা করতে হবে।

"কী রে?" মা ধাক্কা দিল আমায়, "আজকাল কী হয়েছে তোর? এমন পাথর হয়ে যাস কেন মাঝে-মাঝে? উত্তর দিচ্ছিস না!"

আমি বললাম, "হ্যাঁ মা, ঘুমিয়েছে।"

মা বিরক্ত গলায় বলল, "তোরা আমায় কী পেয়েছিস বলতো? কেউ শান্তি দিবি না একটুও! তোর বাপ ওইদিকে পড়ে আছে। তোর ভাইটা অমানুষ। বাড়ি এই অবস্থা জেনেও পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে! আর তুই! দশবার জিজ্ঞেস করলে একবার উত্তর দিস! আমায় বি পেয়েছিস? তোদের সবার খিদমত খাটতে এসেছি এই বাড়িতে? তেল নেই রান্নার! আট ফুরিয়েছে! কে এনে দেবে এগুলো আমায়? ভূত? আমি নিজে যাব আনতে এই পা নিয়ে? তোদের কারও লজ্জা করে না!"

আমি ক্লান্তভাবে তাকালাম মায়ের দিকে। কান দুটো যদি আপনা থেকেই বন্ধ করে দিতে পারতাম! তেল, আটা সব আমিই আনব। যা করার আমিই করব। মাও সেটা জানে। কিন্তু তাও কেন এমন করে বলে কে জানে!

মা আরও কিছু বলত কিন্তু পারল না। নিচের সিঁড়ির থেকে 'রাজি' বলে একটা গলা শুনতে পেলাম। অবাক হয়ে গেলাম আমি! সুজাতাদি! এখন!

আমি ঠোঁট কামড়ালাম! সেদিনের পর থেকে সুজাতাদিকে আর ফোন করা হয়নি আমার। মোন বাবার ব্যাপারটা জানানোই হয়নি!

মা কথা না বলে অবাক হয়ে তাকাল সিঁড়ির দিকে। দেখলাম সুজাতাদি উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। পিছনে লম্বা মতো একটা ছেলে।

আমি এগিয়ে গেলাম, "সুজাতাদি তুমি!"

সুজাতাদি উপরে উঠে দম নিল একটু, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠাস করে চোখে একটা চড় মারব। তুই এত বড় বেয়াদপ জানতাম না তো!"

আমি চোখটা বন্ধ করে মাথা নিচু করে নিলাম। বাইরের লোকের সামনে এ কী কথা বলছে সুজাতাদি!

সুজাতাদি বলল, "এত কিছু ঘটে গেছে আমায় বলিসনি? তুই মানুষ! আমি তোর কোন করিনি আর! নিজেই চলে এসেছি।"

আমি আর মা কী বলব বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সুজাতাদি পিছন ফিরে ছেলেটাকে বলল, "তুই ব্যাগটা রাখ, হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন?"

ছেলেটা হাসল। তারপর কোথায় রাখবে বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, "আমায় দিন।"

ছেলেটা হেসে আমার হাতে ব্যাগটা দিল।

সুজাতাদি বলল, "এতে কিছু ফল আর হেল্থ ড্রিঙ্কস আছে।"

মা আমতা-আমতা করে বলল,"এসব আবার..."

সুজাতাদি মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল "বেশ করেছি! আপনিও বকুনি খাবেন এবার। আপনি তো আমায় একটা খবর দিতে পারতেন! যাই হোক আমায় নিজের লোক মনে করেন না, আমি আর কী বলি!"

"না, না সুজাতাদি..."

"তুই একটা কথাও বলবি না," সুজাতাদি আমার হাতটা চেপে ধরল, "গতকাল খবর পেয়েছি। তারপর আজ সকালে ও এল। বললাম নিয়ে চল।"

আমি ছেলেটার দিকে তাকালাম।

সুজাতাদি বলল, "ও! তোদের তো আলাপ করানো হয়নি। তোরা কে ও আমি। আর ও হল আকাশ। আকাশ বাসু।"

আমি যেন ইলেকট্রিকের শক খেলাম। এই সেই আকাশ! আমি চট করে তাকালাম সুজাতাদির দিকে। সুজাতাদিও যেন আমার এই দৃষ্টিঙ্গর জন্যেই ওয়েট করছিল। আমার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, "নে, আমি আবার লেভেল ওয়ান কমপ্লিট করে দিলাম। তবে এবার যদি ঘেঁটেছিস তবে দেখিস তোকে আমি কী করি!"

ছয়

রিয়ান

শুক্রবার বিকেল চারটের গড়িয়াহাট মোড়টা কেমন হয়? কতজন লোক সেখানে চিৎকার করে একসঙ্গে? কতজন মানুষ সিগনাল-টিগনাল তুচ্ছ করে চলন্ত বাস, অটো আর গাড়ির ভিতর দিয়ে প্যাকম্যান খেলার মতো এদিক ওদিক করে রাস্তা পেরতে চায়? ক'জন ট্র্যাফিক পুলিশ বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, গোলপার্ক, রাসবিহারী আর বালিগঞ্জ স্টেশনের দিকে থেকে ধেয়ে আসা গাড়ির স্রোত সামলাতে হিমসিম খায়? বিকেল চারটের গড়িয়াহাটে দাঁড়ালে মনে হয় না কি যে পৃথিবীর সব রাস্তা, সব মানুষ আর সব গাড়ি এই মোড়টা ছুঁয়েই যায়! মনে হয় না কি এই জনবিস্ফোরণের প্রভাব হাইব্রোজেন বোমার চেয়েও ন্যাংঘাতিক!

আমি ঘড়ি দেখলাম। বিকেল চারটে বেজে দশ মিনিট। আকাশে কমলা রঙের ফোটন ধিকধিক করছে, কিন্তু আমার আশপাশটা কী শান্ত! নির্জন! রাস্তায় এত কম লোক! এত কম গাড়ি! এখানের সব লোকজন আর গাড়ি-ঘোড়া গেল কোথায়? গড়িয়াহাট মোড়ে?

আমি রাস্তার ডানদিকে 'ক্যাফে ব্রাজিল' নামের দোকানটার দিকে তাকালাম। শরৎ আমার সঙ্গেই ছিল, একটু আগে ওই দোকানে গিয়ে ঢুকল। ওর কোর্সের একটা মেয়ে নাকি আজ ট্রিট দেবে।

আজ কলেজে কনসালেন্স ছিল। কিন্তু সময়ের একটু আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে পড়তে বসব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে পড়া আর কলেজ যাওয়া আর আবার পড়া ছাড়া কোনও কাজ নেই।

সপ্তাহে একদিন আমি গ্রোসারিতে যাই কেনাকাটা করতে। বিশাল ট্রলি ঠেলে-ঠেলে দরকারি জিনিসগুলি নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ি। একটি পাথরের মতো মেয়ে আমার দিকে কাচের চোখ নিয়ে তাকিয়ে বিল করে। আমি টাকা মেটাই। তারপর সেইসব মালপত্তর টানতে-টানতে বাড়ি নিয়ে আসি।

যখন কলকাতায় থাকতাম আর বিদেশ থেকে ছাত্ররা ছুটিতে বাড়ি আসত তাদের কথা শুনে যে পৃথিবীর ছবিটা দেখতে পেতাম, এখানে এসে দেখলাম সেই পৃথিবীই এটা, শুধু তাদের না বলা স্পেসবারগুলো এখানে অনেক বেশি। এখন বুঝতে পারছি আসলে লোনলিনেস বলতে কী বোঝায়!

আমার বাবা একটি বেসরকারি অফিসের সেল্স ম্যানেজার ছিল। খুব ভাল কথা বলতে পারত বাবা। দেখতেও খুব সুন্দর ছিল। লম্বা, শ্যামলা গায়ের রং। কাটা-কাটা চোখ মুখ। থুতনিতে খাঁজ। আমি ছোট থেকেই বুঝতাম বাবা যখন কথা বলত আশপাশের সবাই খুব মন দিয়ে শুনত সেই কথা। মা-ও বোধ হয় তাই অমন করে বাবার প্রেমে পড়েছিল।

ছোট থেকেই বাবার ন্যাওটা আমি। বাবা খুব ট্যুর করত। সারা ভারতে ঘুরতে হত বাবাকে। বাবার কোম্পানি বিভিন্ন ল্যাব অ্যাপারেটস বানাত। বাবা সে সবের মার্কেটিংয়ের জন্যই দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেত। মায়ের সঙ্গেই আমার সময় কাটত বেশি। তবে বাবা এলেই বাবার কাছে ঘুরঘুর করতাম আমি। কত গল্প বলত বাবা। কত সুন্দর-সুন্দর জিনিস কিনে আনত!

আর ছিল রজতকাকু। বাবার বন্ধু। কী করে দু'জনের বন্ধুত্ব হয়েছিল আর মনে নেই। কিন্তু এই শান্ত ভদ্র মানুষটি আসত আমাদের বাড়িতে। নানা কাজকর্ম করে দিত। আর রজতকাকুর সঙ্গে আসত রাজিতা। মানে আমাদের রাজি।

বাবা যখন ছুটি পেত আমরা ঘুরতে যেতাম। কখনও-কখনও রজতকাকুরাও যেত আমাদের সঙ্গে। রিশপ বলে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম আমরা। এখনও মনে আছে সেখানে জীবনের প্রথম তুষারপাত দেখেছিলাম। কত বয়স তখন আমার? এই তেরো!

আমরা যে কাঠের কটেজটায় ছিলাম, সেদিন তার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম আমি আর রাজি। সামনে আকাশ থেকে ঝরে পড়েছিল নরম বরফের তুলো। রাজি হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল আমার। মনে আছে ও বলেছিল, "এমন যদি সারা জীবনটা হত!"

সে সময় আমার জীবন খুবই আনন্দের ছিল। ভাল বাবা-মা, ভাল স্কুল। মন দিয়ে পড়াশোনা। ভাল বন্ধুবান্ধব। সব যেন ঝুলনে সাজানো ছবি!

সেদিনের ওই রিশপের কটেজটার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল, এমন সুন্দরভাবেই হয়তো কেটে যাবে আমার বাকি জীবনটা। তখন বুঝতে পারিনি জীবনের অলিগলিতে অচেনা আততায়ী দাঁড়িয়েই থাকে তার চরুচক্রে ছুরি হাতে। বুঝতে পারিনি 'ভাল সময়' আসলে একটা কনসেপ্ট মাত্র! কোনও উপন্যাসের নাম হিসেবে সবচেয়ে প্রযোজ্য!

টিংটিং করে পকেটের ফোনটা নড়ে উঠল। আমি বের করে দেখলাম সামুদা।

সামুদা বলল, "কী রে রিয়ান আজ কী করছিস সন্ধেবেলা?"

আমি বললাম, "পড়ুত বসব আজ্ঞ ইউজুয়াল!"

সামুদা বিরক্ত হল যেন, "শালা মাড়োয়াড়িদের ব্যবসা আর তোর পড়াশোনা কোনওদিন পাগলাটো না! এত পড়িস কেন?"

আমি হাসলাম, "কী করব সামুদা! তুমি তো জানোই আমাদের ওখানে যা পড়ে এসেছি তা কম সে কম চু ডিকেড্স্ ব্যাকের ইকোনমিস্ট। এখানে সব এত অ্যাডভান্সড! সব এত ম্যাথম্যাটিকাল আর স্ট্যাটিসটিক্যাল যে ভাবা যায় না! আমায় সত্যি খুব খাটতে হচ্ছে!"

"দূর", সামুদা আমার কথায় পাত্তা দিল না, "আমি আসব রাত ন'টা নাগাদ। তোর ফ্ল্যাটে রাত কাটাব আজকে। রান্না করিস না আমি খাবার কিনে আনব। তবে তোর ওই শরথ মালটাকে কাছে আসতে দিবি না কিন্তু। এখন থেকেই পড়তে বসে যা। রাতে পড়া আছে বলে ঝামনামো করবি না। বুঝলি?"

সামুদার কথা বুঝব না তা কি আর হয়! আমি ফোনটা কেটে হাসলাম।

আজ কলেজ থেকে বেরিয়ে আমি আর বাস ধরিনি। সব সময় বাসে করে যেতে ভাল লাগে না আমার। এসএমইউ থেকে আমার বাড়ি এক মাইলের একটু বেশি। এটা আমার কাছে কোনও দূরত্বই নয়। আগে তো প্রায় নিয়ম করে আমি পাঁচ কিঃ মিঃ থেকে ভবানীপুরে হেঁটে ফিরতাম। বোসপুকুরের কাছে আমার বন্ধু রনি আর শ্রীপর্ণার বাড়ি থেকে আমার বাড়িতে হেঁটে ফিরতাম।

ওই সেই ভিড়ের ভিতর দিয়েও হাঁটতে ভাল লাগত আমার। আর এখানে এমন সুন্দর নির্জনতা আমায় যেন আরও বেশি করে হাঁটতে বলে!

শরথ আমায় বলেছিল ওর সঙ্গে ওই ব্রাঞ্চিল ক্যাফেতে যেতে। কিন্তু আমি বারণ করে দিয়েছি। আরে আমি পাগল নাকি! ওদের ডিপার্টমেন্টের কাউকে আমি চিনি না। সেখানে যাব কেন?

এখানে একটা জিনিস আমি দেখেছি যে, কেউ খুব একটা কারও গায়ে পড়ে না। সবাই সবাইকে স্পেস দেয়। অন্যকে বিরক্ত করে না। এখানে 'ইউ ফার্স্ট' ব্যাপারটাই যেন রীতি। সবাই লাইনে দাঁড়ালেও একটা দূরত্ব রাখে। হ্যাঁ, কী করে অন্যের কানের কাছে হাসে না। প্যান্টের চেন খুলে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে না। সিগারেট খেতে-খেতে এমন ঘুরে হাঁটে না যেন রাস্তাঘাট সবটাই তাঁর পিতৃদত্ত সম্পত্তি!

আমাদের দেশের চেয়ে এই দেশটা অনেক পরিষ্কার। সাজানো। অনেক বেশি সচল। আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি এখানে এসে! কলকাতা আমায় কষ্ট ছাড়া কিচ্ছু দেয়নি! সেই চোদ্দো বছর থেকে এই বাইশ বছর বয়স অবধি শুধু মনখারাপ আর অপমান নিয়েই যেন বেঁচেছিলাম। যাকে সবচেয়ে ভালবেসেছিলাম তার জন্যই আমার জীবনটা বিষ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম ওই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে। তাই এখন আমার হালকা লাগে খুব। এই যে একা-একা হাঁটছি মনে হয় ভেসে যাচ্ছি মেঘের ভিতর।

এখানে আরও একটা জিনিস দেখলাম সেটা হল কাজের গতি! আমি এখানে যে সব কাজ সেরেছি, সে কলেজ বা সরকারি দপ্তর যেখানেই হোক, কোথাও আমায় হ্যারাস্ড হতে হয়নি! কেউ টাকা চায়নি। নির্লজ্জভাবে ঘুষের কথা বলেনি! আমার কাছে এটা খুব অবাক লেগেছিল! আমাদের শহরটার কথা মনে পড়ছিল। যেখানে অটোচালক থেকে সবজি বিক্রেতা সবাই মেজাজ না দেখিয়ে কথা বলতে পারে না। ঘুষ ছাড়া কোথাও কোনও ফাইল নড়ে না। মরণাপন্ন রোগীকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে লালালরা নিজের টাকার জন্য চাপ দেয়। নেতারা সরকারি টাকাকে নিজের উপার্জনের টাকা ভেবে ফেলে! ছোট জায়গা পরলে মেয়েদের উদ্দেশ্যে নোংরা কথা ও হাত ছুটে আসে! সাফল্যকে টাকা আর জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে মাপা হয়। মনে হয় গোটা দেশটাই যেন টিকিট কাউন্টার হয়ে গিয়েছে! পরিবেষা বলে কিছু নেই। সবটাই ফেলো কড়ি মাখো তেল! এমন একটা দেশে কী করে আমি ছিলাম! কী করে অন্য মানুষজন ঠান্ডা মাথায় এখনও আছে! কেন আমার দেশে প্রতি মিনিটে বিগ্রহ হয় না? কী করে আমরা এতটা ধৈর্যের অধিকারী হলাম? কে আমাদের শিরদাঁড়াগুলো খুলে নিয়েছে? এত কোটি-কোটি লোকের শিরদাঁড়ার হাড় দিয়েই কি ভারিদিকের নানা উৎসবের প্যান্ডেল হচ্ছে? এই উৎসব শেষ হবে কবে? আমরা কবে হাততালি দেওয়া ছাড়াও দুটো হাতের অন্য ব্যবহার করব? শুধু সোশ্যাল নেটওয়ার্কে সেলফি, পণ্ডিতি আর নেশা করা নিয়ে হামবড়াই করে যাব? শুধু ফুকো, লাকা, দেরিদার কথাই শুনব? ছোটবেলায় বল মায়ের কথা শুনব না? মা যে মানুষ হতে বলেছিল সেটা ভুলে যাব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি নিজেকে শান্ত করলাম। জানি এসব ভাবনার কোনও মানে নেই! আমি নিজেই তো এই দেশে পালিয়ে এলাম। ওই দেশে যেকে তো কিছুই করলাম না, করতে পারলাম না। আমি তো সেই চোদ্দো বছর বয়স থেকেই আমার শহর ছেড়ে পালাতে চেয়েছি! সরে আসতে চেয়েছি ওই সবকিছুর থেকে। তাই আমার মুখে সমালোচনা মানায় না।

আমি হাঁটতে লাগলাম। এই পথে এলে আমায় বেশ কিছুটা ঘুরতে হয়। অ্যামসবেরি ড্রাইভে হেঁটে যেতে হলে অন্য পথও আছে। কিন্তু ওই যে শরথ বলেছিল ওর সঙ্গে যেতে, তাই এসেছি।

আমি সামনের ফনজ়ের ফ্লাইভ ব্রে ডানদিকে বাঁক নিলাম। এখন বাড়ি যাব তারপর পড়তে বসব। সামনে কিছু অ্যাসাইনমেন্ট আছে। সেগুলো শেষ করতে হবে। টার্মের শেষে একটা পরীক্ষা হবে, তাতে পাশ না করতে পারলেই তো দেশে ফিরে যেতে হবে। আমি কোনও মতেই আর ওইদিকে যেতে চাই না! আবার মামাদের কথার সামনে পড়তে চাই না। দেখতে চাই না রাতে বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে ছলছল চোখে বসে রয়েছে মা!

"হাই রিয়ান!"

গলাটা শুনে আমি একটু থমকে গেলাম। পাশে একটা দামি গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। কলকাতায় এসব গাড়ি দেখা যায় না। এই ইউনিভার্সিটিতে বহু ছাত্র আছে যারা নানা দামি-দামি গাড়ি করে পড়তে আসে!

আমি দেখলাম নীল রঙের কনভার্টিবলটার ভিতর বসে রয়েছে ইয়ানা। একটু থমকে গেলাম। এখানে ক্লাসের বাইরে পড়া বোঝা ছাড়া আর কেউ বিশেষ কথাও টিচিং স্টাফের সঙ্গে কথা বলে না। আমি যদিও সরাসরি ওদের টিচার নই, তাও আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্তরে আমায় টিএ বা টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতে হয়। ইউনিভার্সিটি যে-টাকাটা আমায় স্টাইপেন্ড হিসেবে দেয় সেটা আমার মুখ দেখে নয়! সপ্তাহে কুড়ি ঘণ্টা আমার তার জন্য কাজ করতে হয়।

ইয়ানা মেয়েটা আন্ডার গ্র্যাডের। আমি দেখেছি! মানে না দেখে উপায় নেই আর কী! এমন ফিগার দেখে যদি ছেলেরা না তাকায় তবে জানতে হবে সে নিজের জেন্ডার সম্বন্ধে এখনও সঠিক তথ্য পায়নি! ওর উপর টেনিস খেলে, সাঁতার কাটে! আরও কী-কী করে কে জানে! আমার তো দেখলে মনে হয় চন্দ্র সূর্য যে-মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে তার পিছনেও ইয়ানার হাত আছে! কিন্তু মনে হলেন হ্যাংলামি থাকলেও মুখে তো আমি সাধ ওদের!

তাই গম্ভীর হয়ে বললাম, "সরি!"

ইয়ানা হাসল, থিক অ্যাকসেন্টে বলল, "স্টপ প্রিটেন্ডিং। ইউ নো মি। আমি যখন টেনিস খেলি তুমি আমায় দেখো।"

লজ্জা-লজ্জা! আমি ভাবলাম হে ধরণী দ্বিধা হতে দ্বিধা কোরো না! তাকিয়ে দেখলাম নীল চোখ, সোনালী চুল, গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট! আরে বাবা এমন মেয়েদের ছবি তো আমি শ্যাওলা ধরা বাথরুমের চল্লিশ পাওয়ারের আলোর তলায় লুকিয়ে দেখতাম! আর তেমন একজন নিজে আমার সঙ্গে কথা বলছে! আর শুধু তাই নয়, ও বলছে আমি ওকে টেনিস খেলতে দেখতাম! তার মানে খেলার ফাঁকে ও নিজেও আমায় দেখত! শিবরাম জানলে কী বলতেন এই নিয়ে!

আমি আমতা-আমতা করতে লাগলাম। খুব ধরা পড়ে গিয়েছি। ইয়ানা আমায় গাড়ভায় পড়েছে দেখে খুব হাসল। ভারী মজা পেয়েছে!

"তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

আমি বললাম, "অ্যামসবেরি ড্রাইভের ধ্য চেস-এ আমি থাকি। বাড়ি যাচ্ছি!"

"আমি পৌঁছে দেব?"

আমি অবাক হলাম। আরে একেই কি পুরনো দিনের লোকজন সুবর্ণ সুযোগ বলত! মানে এমন 'এফ' টিভি টাইপের মেয়েদের নিয়ে ফ্যান্টাসি করার বুকের দমও আমার নেই! সেখানে সে একদম আমায় লিফট দিতে চাইছে!

আমি তাকিয়ে রইলাম ইয়ানার দিকে। ভগবান আমাদের মতো মানুষদের নিজের টেনিদের দিয়ে বানিয়েছেন! কিন্তু ইয়ানাকে বানিয়েছেন নিজের হাতে নাকের ডগায় ঝশমা নামিয়ে চোখে হাই পাওয়ারের লেন্স পরে! এত সুন্দর কী করে দেখতে হয় কাউকে? অমন খাঁড়া নাক! বড়-বড় চোখ! অমন খাঁজ কাটা কিউপিড বো বসানো ঠোঁট! আলতো টোল পড়া থুতনি! এর গাড়ি কি সাধারণ গাড়ি হতে পারে! এর গাড়ির নাম তো পুষ্পক রথ! এমন গাড়িতে বসার ভাগ্য কি আমার হবে?

আমি জানি পৃথিবীতে বিনি পয়সায় কিছু হয় না! ফ্রি লাঞ্চ শুধু আমাদের দেশের স্কুলগুলোয় হয়। তাও তার গুণগত মান নিয়ে যথেষ্ট অসন্তোষ আছে। তাই এই বিদেশ বিভূঁইয়ে এমন একটি মেয়ে যেচে আমায় গাড়িতে লিফট দেবে সেটা তো এমনি-এমনি নয়! আমি বুঝতে পারছি বাঘ বাবাজি সামনে বাঁধা ছাগলটিকেই দেখতে পাচ্ছে শুধু, পাতার আড়ালে মাচায় লুকিয়ে থাকা বন্দুকবাজটিকে দেখতে পাচ্ছে না!

"প্লিজ হপ ইন," ইয়ানা গাড়ির দরজাটা খুলে দিল।

আমি ভয়ে-ভয়েই বললাম। জানি না এবার কী প্রস্তাব আসছে।

গাড়িটা স্টার্ট করে ইয়ানা বলল, "সিত কামফারতেব্‌লি। আই দোন্ত বাইত।"

আমি জানি সেই 'বাইত' খাওয়ার ভাগ্য আমার হবে না!

ইয়ানা হাসল, "ইউ হ্যাভ আ নাইস স্মাইল। তোমার আরও বেশি হাসা উচিত।"

আমি খুশি হতে গিয়েও কেমন যেন চমকে উঠলাম। এই কথাটা আগেও শুনেছি আমি। সেই তেরো বছর বয়সে। সেই রিশপেল।

সেই যে রাজি বলেছিল, "এমন যদি সারা জীবনটা হত!"

তার উত্তরে আমি হেসেছিলাম শুধু। তাতে রাজি আমার হাতটা আলতো করে ধরে বলেছিল, "তুই হাসিস না কেন? এত সুন্দর হাসি! ইউ শুড স্মাইল মোর অফন।"

"কী হল?" ইয়ানা বলল, "কী ভাবছ?"

আমি হাসলাম। মাথা নেড়ে বললাম, "কিছুই না।"

ইয়ানা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "আই নিদ ইয়োর হেল্প।"

আমি হাসলাম আবার। না ওই প্রশংসা শোনার হ্যাংলামিতে নয়! হাসিসা আপনা থেকেই বেরিয়ে এল। কারণ এবার ওই বন্দুকবাজটিকে দেখতে পেলাম যে!

ইয়ানা বলল, "আমার স্ট্যাটিসটিক্সটা খুব উইক। এছাড়াও আরও কয়েকটা সাবজেক্ট আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

আমি সময় নিলাম একটু। তারপর বললাম, "প্রফেসররা তো আছেন তারা তো হেল্প করেন।"

ইয়ানা বলল, "হ্যাঁ করেন। কিন্তু আমার আরও একটু বেসিক লেভেলে হেল্প দরকার। মানে অনেক কিছুই আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

আমি বললাম, "তোমায় কে বলল যে, আমি হেল্প করতে পারব?"

ইয়ানা হাসল, "আই কিপ মাই ইয়ায়স ওপেন। আমি শুনেছি যে, তোমার স্কোর খুব ভাল। ফুল স্কলারশিপে এসেছ!"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। এমন প্রস্তাব খারাপ নয়। কিন্তু এখানে এসে এমন টিউশন জুটবে ভাবিনি।

ইয়ানা বলল, "আমায় বাবা এখানে পড়তে দিতে চায়নি। কিন্তু আমি এখানেই পড়তে চেয়েছি। বাবা তাই রেগে আছে। ভাল রেজাল্ট না হলে মুশকিল হবে। আমি তো স্কলারশিপে আসিনি। তবে টাকাটা আমাদের সমস্যা নয়। বাবার ইগোটাই সমস্যা। তাই যদি আমি রেজাল্ট ভাল না করতে পারি এই সেম-এ আমায় আর এখানে থাকতে দেবে না!"

এক নিশ্বাসে কথাটা বলে থামল ইয়ানা। তারপর আমার মুখের দিকে তাকাল। মানে এবার আমার ডায়লগ!

কিন্তু কী বলব? সব ভুলে গিয়েছি তো! এত কাছে এমন করে একজন বসে থাকলে কি কিছু মাথায় টোকে?

রাজি বলত, "তুই সুন্দরী মেয়েদের সামনে গেলে এমন হয়ে যাস কেন রে? কথা বলতে পারিস না? শুধু...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জিজ্ঞেস করতাম, "কী শুধু?"

রাজি বলত, "শুধু আমার সামনে কথার মস্তানি! আমায় শুধু অবহেলা!"

আমি হেসে বলতাম, "তুই সুন্দরী নাকি? তাই তো তোর সামনে আমি নরমাল থাকি!"

রাজি রাগ করে বলত, "আমি সুন্দরী নই?"

আমি বলতাম, "তোর বাড়িতে আয়না নেই?"

রাজি গম্ভীর হয়ে যেত। মাথা নিচু করে নিত। বলত না কিছু। আমি হাসতাম মনে-মনে। রাজি খুবই সুন্দরী! সেটা তো সবাই জানে! না হলে কি এমনি-এমনি এত ছেলে ওর পিছনে লাইন দেয়! আমি নিজেই তো বলেছিলাম একদিন, "তোর পিছনে যা লাইন, টিকিটের বন্দোবস্ত করলে কিন্তু সারা মাসের হলেকট্রিক বিলের খরচ উঠে যাবে!"

রাজি উত্তর দিয়েছিল, "তোর খুব ভাল লাগে, না?"

আমি হেসেছিলাম, "খুব মজা লাগে!"

রাজি কিছু বলতে গিয়েও আর বলেনি। এবারও মাথা নামিয়ে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল!

সেদিন বুঝিনি, কিন্তু পরে আর-একদিন বুঝেছিলাম রাজির গম্ভীর হয়ে যাওয়ার অর্থ!

ইয়ানা বলল, "কী হল, তুমি চুপ করে থাকছ কেন? ইউ দোন্ত লাইক মাই কম্পানি, নো?"

এই সেরেছে! এ যে উলটো বুঝলি রাম! আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "না, না আমি চিন্তা করছি আর কী!"

ইয়ানা বলল, "এই এসএমইউ-তে স্পোর্টসের প্রসপেক্ট খুব ভাল। আমি এটা হারাতে চাই না। প্লিজ হেল্প মি। আই উইল পে ইউ। চল্লিশ ডলার পার আওয়ার!"

চল্লিশ ডলার! আমি ঘমকে গেলাম। টাকাটা আমার দরকার! খুবই দরকার! মাকে কিছু টাকা পাঠাতে পারলে ভাল হয় প্রতি মাসে। এখানে যা দেয়, তাতে নিজেরই টেনেটুনে চলে, তাই মাকে কিছু পাঠাতে পারি না। কিন্তু আমি জানি মায়ের টাকার দরকার। মামাদের থেকে টাকা নিতে আমার খুব খারাপ লাগে! বিশেষ করে বাবার সম্বন্ধে যখন ওসব কথা শুনতে হয় তখন খুবই কষ্ট হয়। এমনিতে পোস্ট অফিসের এমআইএস থেকে কিছু টাকা পায় মা। কিন্তু সেটা বেশ কম। তাই মামাদের দেওয়া টাকাই ভরসা। মামারাও কখনও কার্পণ্য করে না। কোনও কিছুতেই বাধা দেয় না। মাকে ভালবাসে খুব। তবু বাবাকে নিয়ে কথা শোনায়। হয়তো তারা বোনের প্রতি ভালবাসা থেকেই শোনায় কথাটা। কিন্তু আমি মানতে পারি না। আজও বাবার নামে কেউ কিছু বললে আমার কষ্ট হয়। সব কিছু তার মুখে ছুড়ে মারতে ইচ্ছে করে!

আমি ক্রত হিসেব করে নিলাম। সপ্তাহে তিন ঘণ্টা পড়াতে হলেও মাসে প্রায় পঁচিশো ডলার। অনেক টাকা!

আমি বললাম, "ঠিক আছে। আই উইল। তবে আমি যখন অফিস হোল্ড করি তখনও তো দেখে নিতে পারতে। তোমায় বাড়তি টাকা দিতে হত না!"

ইয়ানা বলল, "বললাম না ওইটুকু টাইমে হবে না। আমার ঘরো লার্নিং চাই। প্লিজ। প্লাস তখন তো আরও অনেকে আসে!"

আমি দেখলাম গাড়িটা আমাদের হট রুডা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বললাম, "ঠিক আছে। এখানে আমি থাকি। তুমি এখানে আসতে পারো।"

ইয়ানা বলল, "থ্যাঙ্কস। তোমার কনট্যাক্ট নাম্বারটা দেবে?"

আমি দিলাম। এখানে কেউ বারও ফোন নাম্বার চট করে চায় না। সবাই ইমেলেই যোগাযোগ করে। এমনকী, প্রফেসরদেরও দেখছি একে অন্যের মোবাইল নাম্বার জানেন না!

আমি গাড়ি থেকে নেমে হাসলাম, "কবে থেকে শুরু করবে?"

ইয়ানা বলল, "নেক্সত মানদে! থ্যাঙ্কস রিয়ান। ইত্স আ প্রিতি নেম।

আমি শুনেছি ইন্দিয়া ইজ আ প্রিতি কান্ট্রি! সোমবার সন্ধেবেলা দেখা হচ্ছে! গুবে?"

পুষ্পক রথটি চলে যাওয়ার পর মনে একটা ভাল ফিলিং হল। না, সুন্দরী মেয়ের জন্য নয়। আমি জানি এসব শোকেসের জিনিস। আমার মতো বিপিএল-এর ছেলেদের জন্য নয়। আমরা কাচের দরজার ওপার থেকে সারা জীবন শুধু সার-সার টিভিতে রংচঙে ছবিই দেখে যাব! আসলে আমার ভাল লাগছে টাকাটার কথা ভেবে! মাকে দুশো ডলার পাঠাতে পারলেও অনেক!

আমাদের এই কমিউনিটিতে একটা ছোট্ট ঘরের মতো আছে। তাতে সবার লেটার বক্স থাকে। আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম কিছু এসেছে কি না! তারপর নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে এগোলাম। কিছু দশ পা যেতে না যেতেই ঘমকে দাঁড়াতে হল আমায়! এটা কী দেখছি আমি!

আমি অবাক হয়ে দেখলাম বাড়ির সিঁড়িতে বসে রয়েছে নানিয়া! চোখ-মুখ লাল। ব্যাপারটা কী!

আমার পায়ের আওয়াজে নানিয়া মুখ তুলে দেখল আমায়। তারপর দৌড়ে এল আমার দিকে। আর আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমায় জড়িয়ে ধরল প্রচণ্ড জোরে! আমি কোনও মতে নিজেকে পড়ে যাওয়া থেকে আটকালাম। নানিয়া চেপে ধরে রেখেছে আমায়। বুঝলাম ও কাঁপছে থরথর করে। কাঁদছে! আমি বুঝতে পারলাম ও একদমই ভাল নেই। নিজের মধ্যে নেই! শুধু বুঝলাম না কেন!

সাত

রাজিতা

পুরো আসছে। কলকাতার চারিপাশ ক্রমশ ঢেকে যাচ্ছে বাঁশ আর ব্যাম্বুতে। বাসের জানালা দিয়ে বুঁকে বাইরেটা দেখলাম। শিয়ালদা স্টেশনভার থেকে নেমেই বাসটা আটকে গিয়েছে। চারিদিকে থিকথিক করছে গাড়ি! দু'জন ট্র্যাফিক পুলিশ হাতে মানিপ্ল্যাক নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে, কিন্তু লাভ হচ্ছে না বিশেষ!

আমি ঘড়িটা দেখলাম। আজ যাব একটা জায়গায়। সেই সাগর সামন্ত বলে লোকটি আমায় একটা রেফারেন্স দিয়েছে।

পবন পোদ্দার বলে একজন ভদ্রলোক বাংলা ছবি করছেন। আর সেই কারণে প্রেয়াকের জন্য নতুন মুখ খুঁজছেন। সাগরবাবু তাকে আমার কথা বলেছেন। তাই সাগর সামন্তর রেফারেন্সে গত কয়েকদিন আগে আমি পবন পোদ্দারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলাম। উনি আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন। তবে সকালে আবার ফোন করে সেটা নিশ্চিত করে নিয়েছি!

জানি না কপালে কী আছে। আমি নিজের গানের একটা স্ক্র্যাচ বানিয়েছিলাম। সুজাতাদিই বানিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। সেটাই দিয়ে আসব ভদ্রলোককে।

আমি জানি না এতেও কিছু হবে কি না! তাও চেষ্টা ছাড়লে তো হবে না।

আমি আর আকাশ বাসুর কাছে যাইনি। হ্যাঁ, জানি আমার চাকরির দরকার। যে-কোনও একটা সম্মানজনক কাজ আমায় এখুনি পেতে হবে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমায় সুজাতাদির খামখেয়ালিপনায় হাওয়া দিয়ে যেতে হবে।

সেদিন সুজাতাদি যেই আমায় ওই 'লেভেল'-এর কথা বলেছিল সঙ্গে-সঙ্গে আমার মাথার ভিতর গোকা নড়ে উঠেছিল। মানে কেবলই মনে হচ্ছিল সুজাতাদির আমায় কী ভেবেছে? সোশ্যাল প্রাইম্বার? এটা কি 'প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস'-এর শহর!

সুজাতাদি সেদিন ঘন্টাখানেক ছিল। তার মধ্যেই বারবার আমায় আর আকাশের আলাদা ঘরে পাঠিয়ে কথা বলাবার চেষ্টা করছিল। কী রাগ হচ্ছিল আমার! আকাশও যে স্পষ্ট বিরক্ত হচ্ছিল সেটা যেন বুঝেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতে চাইছিল না সুজাতাদি।

শেষে আমি বলেই ফেলেছিলাম, "সুজাতাদি এমন কোরো না প্লিজ। আমি এতটাও ডেসপারেট নই।"

সুজাতাদি রাগ করে বলেছিল, "ভালর জন্যই বলছি। পরে বুঝবি!"

আমি আর কিছু বলিনি। আর আকাশের কাছেও চাকরির জন্য যাইনি। জানি আমার চাকরির দরকার খুব কিন্তু কিছুতেই সেটা এইভাবে নয়!

"আজকাল এত চুপ করে থাকিস কেন?" পাশের থেকে জেঠিমা কনুই দিয়ে খোঁচা মারল আমায়।

আমি কিছু না বলে হাসলাম।

জেঠিমা বলল, "এই ঠিকশি বছর বয়সেই এমন বুড়িয়ে গেলি কী করে? না বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করিস! না টিভি দেখিস! না একটু পার্লার-টার্লারে যাস! কিছুই করিস না। কী হয়েছে তোর?"

আমি বললাম, "টিভি দেখি না কেন জানো? বেশি সিরিয়াল দেখলে এই হয়! সব কিছুতেই কারণ খুঁজতে শুরু করে মানুষ!"

জেঠিমা বলল, "পাকামো করিস না! আমি যেন জানি না!"

"তাই? কী জানো?" আমি অবাক হয়ে তাকালাম, "সত্যি জেঠিমা তুমি কেন সব জেনে যাও? মানে আমি নিজের ব্যাপারে যা জানি না সেগুলোও তুমি কী করে জেনে যাও!"

জেঠিমা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল,"যতই ঘুরিয়ে কথা বল আমি জানি!"

আমি জেঠিমার কথার উত্তর না দিয়ে ভিড়ের দিকে তাকালাম। আমরা দোঁহে সিটে বসেছি। কিন্তু জুডো জায়গা পায়নি। সামনের ভিড়ের ভিতর কোথাও একটা আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি না। গতকালই জেঠিমা বলে রেখেছিল যে আজ জুডো আর আমায় নিয়ে বেরবে। জামাকাপড় কিনে দেবে। আমি তীব্র আপত্তি করেছিলাম। কারণ দুটো, এক আমার নতুন জামাকাপড়ের দরকার নেই আর দুই আমায় ওই পবন পোদ্দারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

জেঠিমা কিন্তু তাও ছাড়েনি। আমায় বলেছিল, "তোকে ক'টায় যেতে হবে?"

আমি বলেছিলাম সাড়ে বারোটায় টাইম।

জেঠিমা বলেছিল, "ঠিক আছে। আমার সঙ্গে যাবি, পছন্দ করবি। তারপর চলে যাবি। জুডো তো যাবেই, আমি জুডোর সঙ্গে ফিরে আসব।"

"আমি যাবই!" জুডো অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

"হ্যাঁ," জেঠিমা বলেছিল, "আমরা দশটার সময় বেরোব। মনে থাকে যেন। তোদের দুই ভাইবোনকে যেন আর তেল না দিতে হয় আমায়! জানবি আমার বাবা স্কুল মাস্টার ছিলেন। আদরের শেষ ছিলেন না!"

"কী হল, পাত্তা দিচ্ছিস না আমার কথায়?" জেঠিমা ঠেলল আমায়।

আমি বললাম, "জুডোটা কোথায় গেল!"

"আছে, তুই আমার দিকে তাক," জেঠিমা আমার গালটা ধরে ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে, "কেন কষ্ট পাচ্ছিস ওই জানোয়ারটার জন্য!"

"কী বলছ তুমি?" আমি থতমত খেয়ে গেলাম।

জেঠিমা বলল, "ওই রিয়ান! আগে ভাবতাম কত ভাল ছেলে! কিন্তু পরে দেখলাম বাজে একদম, জানোয়ার একটা!"

"জেঠিমা আস্তে," আমি জেঠিমার হাতে চাপ দিলাম। উত্তেজিত হয়ে গেলে জেঠিমার গলার স্বর চড়ে যায়। এটা লোকজন ভর্তি বাস। বাড়ি উঠোন তো নয়!

জেঠিমা বুঝতে পারল। গলার স্বরটা নামাল। কিন্তু তাতে রাগটা কমল না। বলল, "তোকে সারা জীবন নাচিয়ে শেষে ন্যাকামো! ওর মা কত ভাল মানুষ! তার ছেলে হয়ে এমন লম্পট! বিদেশ গেছে বলে কি সাপের পাঁচ পা দেখেছে নাকি! আমাদের সময় মানুষ নেপাল গেলেই তাকে পাড়ার সবাই পরশা সরিয়ে দেখত। সেই সময় আর নেই যে আমেরিকা গেছে বলেই সবার মুখ দিয়ে জল গড়াবে! এখন সবাই বিদেশ যায়! আমি বাড়ি থেকে বেরই না বলে কি খবর রাখি না কিছু!"

আমি জেঠিমার হাত ধরে বললাম, "এত এক্সাইটেড হচ্ছ কেন?"

জেঠিমা বলল, "তোকে তো দেখছি! কী কুক্ষণেই না ওকে ডুই..."

"প্লিজ জেঠিমা," আমি এবার জেঠিমাকে কথাটা শেষ করতে দিলাম না।

জেঠিমা কেমন যেন চুপ করে গেল হঠাৎ। তারপর বলল, "তোকে সেই শশ দিন বয়সে তোর মা আমার হাতে দিয়ে বলেছিল, এটা তোমারই দিদি। সেদিন থেকে আমি তোকে নিজেরই মনে করি। তুই না বললে কি আমি কিছু বুঝি না? তোর মা চুপচাপ, কিন্তু আমি নই। তোকে কেউ কষ্ট দেবে আর সেটা আমি মেনে নেব? পারব না।"

আমি দেখলাম জেঠিমার চোখ ছলছল করছে। জেঠিমা এমনই। খুব সেন্টিমেন্টাল। ছেলেমানুষ! সহজেই হাসে, রাগে, কাঁদে। জড়িয়ে পড়ে! তাই তো ছোট থেকে আমার মায়ের বদলে জেঠিমার সঙ্গে বন্ধুত্ব! একসঙ্গে সিনেমা দেখা, ফুচকা খাওয়া থেকে শুরু করে লুকিয়ে বান্ধবীদের প্রেমপত্র লিখে দেওয়াতেও জেঠিমা আমার সঙ্গ দিয়েছে।

আমি বললাম, "আরে তুমি কাঁদছ নাকি? চুপ, ছাড়ো তো!"

জেঠিমা আরও কিছু বলত কিন্তু কন্ডাক্টর জোড়া গির্জা বলে ডাক দিল। এখানে আমাদের নামতে হবে। দেখলাম, জুডো ভিড়ের ভিতর থেকে মুখ বের করে বলল, "কী রে উঠে আয়!"

বাস থেকে নেমে আমি আবার তাকালাম জেঠিমার দিকে। জেঠিমা হাসল এবার। বলল, "ঠিক আছি এখন। তোকে এমন শুকনো মুখে দেখতে ভাল লাগে না আমার। তাই রাগ হয়ে যায়। এই যে ছেলেটা গেল, মাসখানেকের বেশি হয়ে গেল তো, কিন্তু তোকে একটাও ইমেল করেছে? ফোন? যে করেনি সেটা তো জানিই! এমন একটা ছেলের জন্য বিরহিনী রাধা হয়ে থাকার কী মানে?"

আমি বললাম, "ওঃ, চলো তো দোকানে। আজ কী হয়েছে তোমার? ডোপ করেছ? নাকি হাঁটুর ব্যথা কম। বোধ হয় কম, না? আমি কিন্তু ওই শ্বেত বেড়ালা না কী, এনে দেব না! হাঁটুর ব্যথা কমলেই তুমি আমায় নিয়ে পড়ো!"

জেঠিমা বলল, "তুই যতই বল! ছেলেটা ভাল না! কলির কেষ্ট একদম!"

জুডো জেঠিমাকে ধরে রাস্তাটা পার করে দিল। আমিও গেলাম পিছন-পিছন কিন্তু সব কেমন যেন আবছা হয়ে গেল। বুকের ভিতর আবার হুল ফোঁটে দিল মৌমাছি! কলির কেষ্ট! নানিয়া বীর্লো! একটা জিনিস ছোট থেকেই আমি দেখেছি। রিয়ানের দিকে মেয়েরা আকৃষ্ট হয়।

স্কুল জীবনেই একবার মা আমায় জন্মদিন করেছিল। রিয়ানদের তো নেমন্তন্ন ছিলই, সঙ্গে আমার দু'-একজন বান্ধবীও এসেছিল। তার মধ্যে সেই পিউও ছিল।

রিয়ান তখন ষোলো বছরের। হালে হালকা দাড়ি। গম্ভীর। একা-একা থাকে।

আমাদের বাড়িতে এসে উনতলার সাঁকোটার কাছে দাঁড়িয়েছিল। কারও সঙ্গেই বিশেষ কথা বলছিল না।

আমি জানি ওর মুড। তাই ঘাঁটাইলাম না। কিন্তু পিউ নাছোড় ছিল।

বলেছিল, "এই তোর হিরো! ব্যাপক কিন্তু! সেক্সি! এখনও চুমু খায়নি? তুই একটা অপদার্থ!"

আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল, "তুই ওইদিকে তাকাচ্ছিস কেন?"

পিউ চোখ টিপে বলেছিল, "কিছু তো করতে পারব না। অন্তত দেখতে দে!"

সেই থেকে দেখেছি মেয়েরা এমনিতেই পছন্দ করে রিয়ানকে। অমন চুপচাপ, ভুলো চোখের ছেলে বলেই কি! হবে হয়তো!

কিন্তু যতবার কোনও মেয়ে রিয়ানকে পছন্দ করেছে আমার কষ্ট হয়েছে। যেমন আজও হয়। কিন্তু কোনও দিনেই রিয়ান কারও সঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি! ওর বাবা মারা যাওয়ার পর রিয়ানের যেন আরও জেদ বেড়ে গিয়েছিল! যেন আরও ভাল রেজাল্ট হচ্ছিল। আমায় শুধু বলত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখান থেকে ওকে চলে যেতে হবে। এসব প্রেম-টেমের মতো ফালতু ব্যাপার নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না। এই শহরটা ছেড়ে যেতে না পারলে ওর মুক্তি নেই!

তখন মজা লাগত এটা শুনে। মনে হত, যাক ও অন্য কারও কিকে তো মন দেবে না! আমার হয়েই থাকবে। আসলে তখন বয়স কম ছিল। তাই ওর কথার পরের অংশটার গুরুত্ব বুঝিনি! ও যে সত্যি এই শহরটার থেকে মুক্তি খুঁজছে, বুঝিনি!

এখন মনে হয় পরের অংশটাই বোধ হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল! রিয়ান যে সত্যি এভাবে মুক্তি খুঁজে পাবে ভাবতে পারিনি। ও যে নিজের জন্য এমন একটা নতুন পৃথিবী তৈরি করে নেবে বুঝিনি। বুঝিনি সেখানে আমার কোনও জায়গা হবে না!

শপিং করতে আমার ঠিক দশ মিনিট লাগল। দুটো কটনের কুর্তি আর একটা লেগিংস পছন্দ করেই আমি রণে ভঙ্গ দিলাম। আসল এটাও না হলে আমার চলত। বাবার অমন শরীর খারাপ। সেখানে এসব তো বিলাসিতা। তা ছাড়া কাজও কিছু পাচ্ছি না। সঙ্গে রিয়ানের জন্য সারাক্ষণ বুকের ভিতরে একটা শূন্যতা! এসবের মধ্যে কী করে আমার শপিং ভাল লাগবে!

নেহাত জেঠিমা জেদ করেছে তাই এসেছি!

তবে এটুকু কোনকাটায় জেঠিমা খুশি হচ্ছিল না। বলছিল জিন্স নিতে হবে। টি-শার্ট নিতে হবে। আমি ওসব নিইনি। জেঠিমা কিনতে পারলে আর কিছু চায় না। কিন্তু আমায় আর টানতে পারেনি।

আমি আমাটুকু সেরেই বেরিয়ে এসেছি। জেঠিমা আর জুডো এখন করুক শপিং। পবন পোদ্দারের কাছে যাওয়া আমার জন্য জরুরি।

গত দু'দিন বৃষ্টি হয়নি। কনকনাতায় আবার সেই গুমোট গরম আর চ্যাচ্যাটে ঘামটা ফিরে এসেছে। আমি রাস্তায় নেমে ঘড়ি দেখলাম। প্রায় বারোটা বাজে। এখান থেকে পবন পোদ্দারের অফিস কিছুটা দূর। কিন্তু এমন দূরও নয় যে যাব ধরতে হবে।

রিয়ান চলে যাওয়ার পর আমার একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। হাঁটা বেড়ে গিয়েছে! সেদিন তো এসপ্ল্যানেড থেকে হেঁটে আমি বাড়িতে এসেছি। কেন এটা হয়েছে জানি না। কিন্তু হয়েছে!

আমার এমনিতে খুব কিছু বন্ধুবান্ধব নেই। আসলে পুরো সময় তাই রিয়ানকে দিয়ে দিয়েছিলাম। তার ফলে অন্য কিছু তৈরিই হয়নি। যারা বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিল তারা সাড়া না পেয়ে সরে গিয়েছে। আর এখন রিয়ান নিজেই সরে যাওয়ায় আমি পুরো একা।

রাতে যখন ঘুম আসতে চায় না, আমার আরও একা লাগে। তখন মনে হয় তবে কি আমি রিয়ানকে সব দিয়ে ভালবেসে ভুল করেছিলাম! নিজের জন্যও কি নিজেকে কিছুটা বাঁচিয়ে রাখার দরকার ছিল! প্রেমের মহান আদর্শ তো কেবল সিনেমা-উপন্যাসেই হয়! বাস্তবে সেসব যারা প্রয়োগ করতে চায় তারা তো বোকা! বোধে না যেটাকে তারা সব ভাবছে আসলে সেটা তেমন কোনওদিনই ছিল না!

এসব ভাবতে-ভাবতে শরীরটা কেমন যেন খারপ লাগে আমার! মনে হয়, এত দেশ, মহাদেশ, সাগর, মহাসাগর পেরিয়ে সেই নতুন শহরে এখন তো দিন! কী করছে রিয়ান? ওর ওই বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করছে? ঘুরছে? নাকি অন্য কিছু করছে? 'আমি' বলে যে কেউ ছিলাম সেটা কি ওর মনে পড়ে আর! আমি জানি ওর আর আমাকে মনে পড়ে না। নিজেকে উদ্যম মনে হয়! মনে হয় যা ছিল না সেটাই কী করে এতগুলো বছর দেখলাম! কেন নিজেকে এমন একটা অন্ধ বাইরেলে আটকে রাখলাম!

আমি তখন বারান্দাটায় এসে দাঁড়াই। দেখি ভাঙাচোরা সাঁকো দু'হাত দিয়ে আগ্রাণ ধরে রেখেছে দু'-দুটো পুরনো বাড়িকে! পুরনো সম্পর্ককে! কিন্তু কতদিন? এই ভেঙে পড়া সাঁকো কত দিন দুটো বাড়িকে সম্পর্ককে? কত দিন সে ধরে রাখতে পারবে দুই মহাদেশের দু'জনকে!

আমি দেখি সামনের বাড়ির তিনতলার বন্ধ জানলার পাখির পিছনে তিরতির করে কাঁপছে আলো। বুঝি সেই যে ছোটবেলায় রূপকথার গল্প বলত চাঁদের বুড়ি, বন্ধ জানালার ওপারে সেও জেগে আছে আমার মতো। একা।

পবন পোদ্দারের কোম্পানির নাম 'মেলোডি অ্যানলিমিটেড'। একটা মাল্টিস্টোরেডের দোতলায় দেখলাম বড় করে সাইনবোর্ড লাগানো রয়েছে। গেটে দরোয়ান ছিল। কিন্তু আমায় আটকাল না। বলল্ও না কিছু। একতলায় গ্যারেজের পাশ দিয়ে সোজা গেলে পাশাপাশি দুটো লিফট্। আমি একটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বেশি অপেক্ষা করতে হল না। লিফ্ট এসে গেলে নিমেষের মধ্যেই।

দোতলায় লিফ্ট থেকে বেরিয়ে একটা ফাঁকা জায়গা। ডানদিকে একটা করিডর চলে গিয়েছে। দেখলাম দেওয়ালে লেখা আছে 'মেলোডি অ্যানলিমিটেড দিস ওয়ে'।

সেই নির্দেশ ধরে এগিয়ে দেখলাম একটা ঘষা কাচের দরজা। গায়ে নাম লেখা আছে কোম্পানির। নাম দেখে বুঝলাম এটাই আমার গন্তব্য!

রিসেপশানে একজন বয়স্ক মহিলা বসেছিলেন। আমায় দেখে নির্বিকার মুখে তাকালেন। তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে কমপিউটারে খুটখাট শুরু করলেন।

"এক্সকিউজ মি," আমি ঝুঁকে পড়লাম।

ভদ্রমহিলা আমার দিকে না তাকিয়ে রোবটের মতো গলায় বললেন, "বলুন।"

"আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। মিস্টার পবন পোদ্দারের সঙ্গে। উনি আমায় আসতে বলেছিলেন," কথাটা শেষ করে আমি নিজের নাম বললাম।

ভদ্রমহিলা একইভাবে বললেন, "দেখা হবে না। স্যার নেই।"

"নেই!" আমি অবাক হলাম, "আজ সকাল ন'টায় ওকে ফোন করেছিলাম। বুললেন আসতে। আর নেই!"

"না নেই," ভদ্রমহিলা এবার কৃপা করে আমার দিকে তাকালেন, "আপনি স্যারের জন্য এসেছেন তো? কোনও সিডি আছে? দিয়ে যান।"

আমি বললাম, "কিন্তু উনি তো বললেন নিজে শুনবেন! মানে কথা ছিল..."

ভদ্রমহিলা কথা শেষ করতে দিলেন না আমায়। বললেন, "শুনুন অমন কথা উনি অনেককে বলেন। সেটা ইমপরট্যান্ট নয়। এমন কথা ওঁকে সারাদিন বলতে হয়। নিজেকে লাট মঙ্গেশকার ভাবে এমন মেয়েদের তো অভাব নেই। দিয়ে যান।"

আমার হঠাৎ মনে লাগল, "না থাক। আমি দেব না।"

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, "শুনুন ভাই, আমি বুঝতে পারছি আপনার মনের অবস্থা। ব্যাপারটা বুঝুন। উনি আর সিডি বের করেন না। খুব নামকরা গাইয়ে হলে এক কথা। কিন্তু নতুনদের মার্কেট নেই। এমনিতেই গানের বাজার খুব খারাপ। মানুষ ইন্টারনেট থেকে গান ডাউনলোড করে করে সব শেষ করে দিয়েছে। বিনে পয়সায় গান পেয়ে গেলে কে আর গাঁটের কড়ি খরচ করে? কত বড় মিউজিক শপ জাস্ট উঠে গেল! এটা একটা লাল বাতি জ্বলা ইন্ডাস্ট্রি। কিছু হবে না। আপনি ভাই রিয়েলিটি শোতে ট্রাই করুন। যদিও সেখানেও শুনেছি নানা ম্যানিপুলেশন রয়। তাও ওটাই করুন।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। কথাটা সত্যি। পাইরেসি এমন একটা জায়গায় চলে গিয়েছে যে-মানুষ এই চুরিটাকে লিগাল ভেবে ফেলেছে!

শিল্পীদের কাছে খুবই হতাশাজনক, কিন্তু কে আটকাবে! কে ব্যবস্থা নেবে! এ দেশে কিছু করার নেই! যারা এসব করে, তারা বোঝে না যে খালি পেটে কোনও শিল্পই হয় না! যদি এটাই চলতে থাকে একটা দিন আসবে যখন কেউ আর গানটান গাইবে না।

আমি বললাম, "তাও যদি ওঁর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যেত! উনি সিঙ্গেল গান গাওয়ার কথা বলেছিলেন।"

ভদ্রমহিলা কিছু বলতে গিয়েও থমকে গেলেন, তারপর আমার পিছনের দিকে কাউকে একটা দেখে হেসে দাঁড়িয়ে উঠলেন। আর ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সময়ে আমি শুনলাম একটা গলা। বলছে, "আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলাম আপনি এলেন না। আর এখানে বিল্ডে না কিন্তু আপনি ট্রাই করছেন।"

গলাটা শুনে আমার কেন জানি না গায়ে কাঁটা দিল হঠাৎ! আমি চট করে পিছনে ঘুরলাম। দেখলাম।

"সুজাতাদি ঠিক বলেছেন। আপনি সত্যি অদ্ভুত!" কথাটা বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল আকাশ বাসু!

আট

রিয়ান

আমাদের পাড়ায় দুর্গাপুজো হয়। খুব বড় না হলেও বেশ আন্তরিকভাবেই হয়। আমাদের বাড়ির গা ঘেঁষে প্যান্ডেল ওঠে। বিশ্বকর্মাপুজোর পর পরেই বাঁশ পড়ে যায়। তারপর শুরু হয় প্যান্ডেলের কাঠামো বাঁধার কাজ! না কোনও ঝিম-টিম হয় না। সাবেক মতে প্যান্ডেল করা হয়। ডাকের সাজে ঠাকুর হয়। চতুর্থীর মাঝ রাতে পাড়ার ছেলেরা হইহই করে ঠাকুর নিয়ে আসে।

তারপর ষষ্ঠীর সকালে মাইকে চণ্ডী পাঠ হয়। শুরু হয় ঢাক আর পুজোর স্তোত্র। অষ্টমীতে সবাই মিলে একসঙ্গে ভোগ খাওয়া। সন্ধিপুজো। শেষে দশমীর রাতে ভাসান।

এসব তো সবাই জানে। আমিও জানি। তবে এটুকুই জানি। কারণ পুজোর দিনগুলোয় আমি বাড়ির বাইরে বেরোতাম না একটুও। বই নিয়ে বা ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকতাম চুপ করে।

বাবা যত দিন ছিল বেরোতাম। বাবাই নিয়ে বেরোত। গাড়ি ভাড়া করে আমরা আর রাজিতাদের বাড়ির সবাই মিলে সারারাত ধরে কলকাতার ঠাকুর দেখতাম।

আমার খুব একটা ভাল লাগত না। ছোট থেকেই ভিড় আমার পছন্দ নয়।

মা জিজ্ঞেস করত, "সবাই বেরোতে চায়, তুই চাস না কেন?"

আমি বলতাম, "জানি না। আমার ভাল লাগে না।"

মা রাগ করত, "এত ঘরকুনো কেন তুই? কেন ভাল লাগে না?"

আমি চুপ করে থাকতাম প্রথমটা। তারপর বলতাম, "তোমার তো সকালবেলার আকাশ দেখতে ভাল লাগে মা। সেটা কেন ভাল লাগে?"

মা আরও রেগে যেত, বলত "খুব মুখে-মুখে কথা বলতে শিখেছিস, না?"

তখন বাবা আসত, হাসতে-হাসতে বলত, "তোর মা বুঝবে না। আমি জানি তোর ভিড় ভাল লাগে না। কিন্তু তুই না বেরোলে আমার যে কষ্ট হয়।"

বাবা নেই। আমি পুজোয় ঘুরতে না বেরোলে আর কেউ কষ্ট পাওয়ারও নেই। তাই আর পুজোয় বেরোতাম না।

আমি পুজোয় শুধু শব্দ শুনতাম। শব্দ শুনে বুঝতাম পাড়ায় কী হচ্ছে! মা ঠেলত। মামারা এসে জোর করত বেরোবার জন্য। কিন্তু আমি কোনও কথাই শুনতাম না। কারও কথাই শুনতাম না।

পুজোর দিনগুলোয় রাজি রোজ আসত। কাকিমা কিছু না-কিছু খাবার বানিয়ে পাঠাত রাজির হাত দিয়ে। আমি রাগ করতাম। বলতাম, "তুই কেন সেই নর্দা থেকে এই ভিড় ঠেলে রোজ আসিস?"

ও রাগ করত না। শান্ত গলায় বলত, "আমার কষ্ট হয় না। আমার ভাল লাগে। তা ছাড়া তুই বাড়িতে একা বসে থাকিস। আমার মনে হয় যাই গিয়ে তোর একটু মাথা খাই!"

আমি বলতাম, "শুধু-শুধু ব্যাটারি খরচ করিস না। আমাদের সময়গুলো আর আমরা নিজেরাও এক ধরনের ইনভেস্টমেন্ট। যেখানে সেখানে করতে নেই।"

রাজি প্রথমে কিছু বলত না। শুধু একবার তাকিয়ে মাথা নামিয়ে নিত। তারপর কিছু বলত হয়ত, কিছু শুনতে পেতাম না। কারণ কেন জানি না ঠিক সেই সময়টাতেই প্রতিবার পাড়ার ঢাকটা বেজে উঠত জোরে। আর রাজির সব কথা ঢেকে যেত সেই শব্দে! আমি অবাক হয়ে ভাবতাম এমনটা হয় কী করে?

রাজি সকালবেলা আসত আর সন্ধেবেলা ফিরে যেত। চার দিনই এক রুটিন।

আমার বেশ মনে আছে। সেবার আমরা দু'জনেই কলেজে ভর্তি হয়েছি। ফার্স্ট ইয়ার। সপ্তমী পুজোর দিন ছিল সেটা।

দুপুরে খাওয়ার পরে রাজি এসে আমার ঘরের এটা ওটা গোছাচ্ছিল। আমি কিছু না বলে দেখছিলাম ওকে। আর সত্যি বলতে কী রাগ হচ্ছিল আমার খুব। এসব হচ্ছেটা কী! একটা এই বয়সের মেয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে না গিয়ে আমার ঘরের বইপত্তর গোছাচ্ছে কেন! এটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বাংলা সিনেমা নাকি?

আমি বলেছিলাম, "এই রাজি, তুই কাল থেকে আসবি না।"

রাজি প্রথমে বুঝতে পারেনি আমি কী বলছি। ও নিজের মনে গুনগুন করতে-করতে কাজ করছিল। আমার বলা বাক্যটার মধ্যে ও শুধু নিজের নামটুকু শুনেছিল!

আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী বলছিস?"

আমি আরও রুক্ষভাবে বলেছিলাম, "বলছি কাল থেকে একদম আসবি না এখানে।"

"কেন?" রাজি পাথরের মতো স্থির হয়ে গিয়েছিল নিমেষে।

আমি চোয়াল শক্ত করে বলেছিলাম, "তোকে কারণ বলতে যাব কেন? যা বলছি শুনবি। আসবি না।"

রাজি বলেছিল, "কেন আসব না সেটা বলতে হবে।"

আমি আরও রেগে গিয়ে বলেছিলাম, "তোর কোনও বয়েক্কত নেই?"

"ছেলেমো..."

"ন্যাকামো করিস না," আমি খিঁচিয়ে উঠেছিলাম, "প্রেমিক আছে তো খুব প্রোপোজ়াল পাস! একটাকেও জোটাসনি? তার সঙ্গে ঘুরতে যেতে পারিস না?"

রাজি বলেছিল, "তোর কি খুব অসুবিধা হয় আমি এলে?"

আমি বলেছিলাম, "তোর মতো একটা অল্পবয়সি মেয়ে কেন এমন করে থাকবে? কেন বেরোবি না তুই? তোর বাবা আছে, মা আছে, ভাই আছে। সবাই আছে। তাহলে তুই কেন পড়ে থাকবি এখানে? কেন থাকবি এমন করে?"

রাজি পাল্টা বলেছিল, "তুই কেন থাকিস এমন করে? এমন ঘরের মধ্যে। নিজেকে বন্দি রাখিস কেন?"

আমি বলেছিলাম, "আমি যা খুশি করব। শুধু তুই এখানে আসবি না।"

"কেন?" রাজি জেদি গলায় জিজ্ঞেস করেছিল।

আমি বলেছিলাম, "আমি বলছি তাই।"

"তুই এমন থাকিস কেন সেটা আগে বল। পাশ কাটাবি না।"

আমি শক্ত গলায় বলেছিলাম, "শোন রাজি, আমি এখানের কোনও কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাই না। কোনও কিছুতে নিজেকে ইনভল্ভ করতে চাই না। আমি নিজেকে তৈরি করছি। যেদিন সুযোগ পাব সব ছেড়ে চলে যাব। এই দেশ, এই শহর আমার নয়। আমি থাকব না এখানে।"

রাজি শান্ত গলায় বলেছিল, "এক কথা বারবার বলিস কেন? আর ঠিক আছে, যত দিন আছিস তত দিন আমি আসব। তারপর না হয় আসব না। কিন্তু যত দিন আছিস তত দিন আসবই। কারণ..."

কারণটা আর শোনা হয়নি। কারণ ঠিক তখনই প্রচণ্ড জোরে ঢাক বেজে উঠেছিল পাড়ায়।

গাড়ি ভিতরটা নিস্তব্ধ! সামুল চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে মুড ভাল নেই। আমি কথা না বাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। বিকেল শেষ হচ্ছে। এখন অক্টোবরের মাঝামাঝি। ঠান্ডা পড়েনি। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিন ছোট হয়ে গিয়েছে।

কলকাতায় পুজো শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখানে পুজো এখন। পুজোর কাছাকাছি শুক্র-শনিবার করে এখানের বাঙালিরা দুর্গাপুজো করে। মূলত দুটো বড় পুজো হয়। একটা হল 'বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন অফ ডালাস-ফোর্টওয়ার্থ' আর অন্যটা হল 'আন্তরিক'।

এসব পুজোয় স্টুডেন্টরা খুব একটা থাকে না। এখানে যেসব বাঙালিরা মূলত চাকরি করে তাদেরই উদ্যোগে পুজো হয়। আমিও যেতাম না। কিন্তু সামুদা জোর করল। অ্যাডমিশন ফি পঞ্চাশ ডলারের মতো। আমি দিতে চেয়েছিলাম। সামুদা ধমক দিয়েছে।

কাছের একটা বড় হাইস্কুল ভাড়া নিয়ে পুজো হচ্ছে। ফাইবার গ্লাসের প্রতিমা। শুনলাম দশ-বারো বছর ধরে এই প্রতিমায় পুজো হচ্ছে। পুজো হয়ে গেলে ঠাকুরটিকে স্টোরেজে রেখে দেওয়া হয়।

শুক্রবার ষষ্ঠী-সপ্তমীর পুজো হয়। শনিবার দুপুর অবধি হয় অষ্টমী-নবমীর পুজো। আর শনিবার বিকেলে দশমী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। কলকাতা থেকে কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে আসা হয় গানবাজনা করার জন্য।

পুজোর হইচই কোনও দিনই ভাল লাগে না আমার। আর বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে তো আরও বেজে লাগে। বড়মামা বলে, 'তোর বাপটা যতটা বারমুখো ছিল, ততই ততটা ইন্টোভার্ট! কেন রে?'

আমি উত্তর দিই না। সব কিছুকেই মামার বাড়ির লোকজন বাবার রেফারেন্স বলে। শুধু মামাবাড়ি নয়। আমার মনে হয় সবাই তাই করে। আমি বুঝতে পারি না বাবা যা করেছে তাতে আমার কী দোষ! আমার বাবার উপর রাগ হয় খুব! মনে হয়, লোকটা কোনও দিন ভালইবাসেনি আমায়। শুধু ভান করে গিয়েছে।

ছোট থেকেই এই একাচোরা মনটা বাবার মৃত্যুর পর যেন আরও একা হয়ে গিয়েছে। কোনওরকম উৎসব অনুষ্ঠান দেখলেই আমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হল, 'যাব না!' এবারও আমি আসতে চাইনি এই পুজোয়। কিন্তু সামুদা এমন জোর করল! সামুদার কোনও কথা আমি ফেলতে পারি না।

"কীরে কেমন লাগল পুজো?" সামুদা হালকা চালে জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, "ওই আর কী! বড়লোকদের ব্যাপার। কয়েকজনকে তো দেখলাম মানি ফ্রেজিং করে গোল সারাক্ষণ! তবে ভন্ডারঅল ভাল। দেশের থেকে এত দূরে এসে থাকা! সেই হিসেবে ভালই!"

সামুদা বলল, "এরকমই হয় সবাই। গল্প করে। একটু খাওয়া-দাওয়া হয়। খারাপ কেন হবে! প্লাস দুর্গাপুজো নিয়ে বাঙালির তো চিরকালীন একটা পাগলামো আছেই!"

আমি কিছু বললাম না। বাইরের দিকে তাকালাম। বাইরে এখন অন্ধকার। এখানে পাড়ার ভিতরের রাস্তাগুলোয় আলো খুব কম। শুধু দূরে-দূরে একটু করে আলো দেওয়া। আমি একা-একা হাঁটি এখানে। ঝিঁঝিঁ ডাকে। যেন ঠিক কোনও মফসসল! তার উপর মানুষজন কম। এক-এক সময় তো মনে হয় ভূত-টুত বেরিয়ে আসবে চারিদিকের গাছপালার মধ্যে থেকে।

সামুদা বলল, "রাজিতা কথা বলিস না তো! কেমন আছে ও?"

আমি কিছু বললাম না। বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সামুদা হাসল, "কীরে কেসটা কী? অ্যাভয়েড করছিস?"

আমি বললাম, "দেখো সামুদা, রাজিতা খুব ভাল মেয়ে। কিন্তু ওই দেখ থেকে যখন শেকড় তুলে নিয়েছি তখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই! তবে ওটা শুনলাম যে রজতকাকুর নাকি শরীর খুব খারাপ। সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। কোম্পানিও লক আউট। মা ফোনে বলেছিল।"

সামুদা অবাক হল, "সে কী রে! সাংঘাতিক ব্যাপার তো! উনিই তো একমাত্র আর্নিং মেম্বার। তা হলে!"

আমি চুপ করে থাকলাম। কথাটা সত্যি। কিন্তু তাতে আমি কী করব! অ্যামসবর্গি ড্রাইভ আর বেনিয়াটোলা লেন বাইলেনের দূরত্বটা কি ভুলে গিয়েছে সামুদা!

সামুদা বলল, "তুই খবর নিয়েছিস?"

আমি বললাম, "পাঁচ বছর এখানে থেকে ডিগ্রি নেব। তারপর এখানেই চাকরি করব। মাকে নিয়ে আসব, ব্যস! কলকাতায় আমার কেউ নেই!"

সামুদা আরো অন্ধকারে তাকাল আমার দিকে। তারপর মাথা নাড়ল নিজের মনে। বলল, "ইট্স নাইস টু বি ইমপরট্যান্ট রিয়ান। বাট রিমেমবার, ইট্স ইমপরট্যান্ট টু বি নাইস!"

বাড়ি অবধি গেল না সামুদা। বড় রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে শুধু জিজ্ঞেস করেছিল কাল পুজোয় যাব কি না! আমি বারণ করেছি!

আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম, সামুদা উপরে আসবে কি না!

সামুদা শুধু বলেছিল, "সেই শুক্রবার তো রাতে এসেছিলাম! শালা, সারা রাত অমন ভুতোম প্যাঁচার মতো মুখ করে ছিলি কেন কে জানে! আর তোর ঘরে ঢুকে ওই মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে না!"

আমি কিছু উত্তর দিইনি, আসলে সব কথা নিজের আইডলকেও বলা যায় না!

বড় রাস্তা থেকে আমার বাড়িটা একটু দূরে। আমি আধো অন্ধকারে হাঁটতে লাগলাম। শীত আসতে দেরি। তবে সন্ধের পর তাপমাত্রা বেশ কমে যায়। একটু চিলচিলে ঠান্ডা যেন জড়িয়ে আছে হাওয়ায়। 'ফল' শুরুর সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাপেল গাছের পাতায় মরচে ধরতে শুরু করেছে। টেক্সাস তো সাদার্ন স্টেট, ঋতুটেই ইট্স কোস্ট বরাবর এই 'ফল' ব্যাপারটা খুব সুন্দর দেখা যায়। মনে হয় গোটা চত্বর জুড়ে আগুন লেগে গেছে!

এখানে সেমেস্টারের প্রথম সপ্তাহে পরীক্ষা আছে আমাদের। তারপর এক মাস ছুটি। আমার এখনও অবধি পড়াশোনার আগ্রহটা ভাল। তাই আমার প্রফেসর জোন্স বলেছেন যে, উইন্টার ব্রেকে কিছু স্পেশাল ক্লাস হবে আন্ডার গ্র্যাডদের। আমি চাইলে ক্লাস নিতে পারি। দু'হাজার ডলার মতো উপরি রোজগার হতে পারে। খুবই ভাল প্রস্তাব।

এখানে যে টাকাপয়সা পাই, তাতে খুব কষ্ট করে চলে আমার। এখানে আসার আগে যে এল ডোরাডোর কথা শুনেছিলাম, এখানে এসে বুঝতে পারছি গোটাটাই আসলে হলিউডের ছবি। বাস্তবটা খুব কঠিন। খুব কষ্ট করে থাকতে হয়। টাকা-পয়সা মেপে খরচ করতে হয়। বাইরে খাওয়ার প্রশ্নই নেই! সারাক্ষণ মনের পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতো বাজতে থাকে 'পয়সা বাঁচাও, পয়সা বাঁচাও!' সেখানে আমি দু'হাজার ডলার অতিরিক্ত কামাবার সুযোগ পাচ্ছি! চাট্টিখানি কথা নয়! আমি বলেছি ক্লাস নেব। আমার তো কিছু করার নেই। দেশে তো আর ফিরব না!

অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলেই নাকে ঝাঁঝালো সর্ষের গন্ধ পেলাম। শরথ রান্না করছে! প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো ও ভেজেটেরিয়ান। পরে দেখি মোটেও তা নয়। বরং বলে, "গাছপালা এত কাটলে চলে! এমনিতেই গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে! তার চেয়ে প্রাণী কমা! অক্সিজেন বাড়বে পরিবেশে!"

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আরে, তুই এসব খাস বাড়িতে জানে?"

শরথ বলেছিল, "পাগল! আমরা কেরলের আইয়ার ব্রাহ্মণ। বাবা জানতে পারলে কেলিয়ে লাট করে দেবে! বাড়িতে গেলে তাই খুব চাপ হয়।"

আমি ঘরে ঢুকে বললাম, "কী রে? আশপাশের ফ্ল্যাট থেকে নাইন ওয়ান ওয়ান ফোন করবে! বলবে সন্ত্রাসবাদীরা গ্যাস বোমা ছেড়েছে!"

শরথ হাসল, "কেন বলবে? তোর কি মনে হয়, ওরা বেশি প্যানিক করে?"

এই সেরেছে! শরথ আবার প্রশ্ন শুরু করেছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, "আমি ঘরে গেলাম।"

শরথ বলল, "আমি ঝোসারি থেকে সব নিয়ে এসেছি আজ। নেক্সট উইক তোকে যেতে হবে কিন্তু।"

আমি মাথা নেড়ে আর দাঁড়ালাম না।

আমি ঘরে এসে জামাকাপড় পালটে নিলাম। পড়তে বসব। এখানে একটুও সময় নষ্ট করতে পারি না। কিন্তু বইটা খুলেই ঘমকে গেলাম। প্রথম পাতায় নামটা দেখে চেনা একটা লাগল। নানিয়া ধীর্ঘো! নানিয়ার বই এটা। এখনও নিয়ে যায়নি। আমিও দিয়ে উঠতে পারিনি। আসলে সেইদিনের পর নানিয়া আর আসেনি আমার ঘরে। আমিও কথা বলিনি ওর সঙ্গে।

'রিবাউন্ড' বলে একটা কথা আমি শুনেছিলাম আগে। কিন্তু আমল দিইনি। আমার সঙ্গে এসব তো হয়নি কখনও। আর জানতাম, হবেও না।

সেদিন ওই ভেঙে পড়া 'লেগো' ব্লকের মতো নানিয়াকে নিয়ে আমি আমার ঘরে বসিয়েছিলাম। খুব কাঁদছিল ও। আমি বুঝতে পারছিলাম না কী হয়েছে। শুধু কাঁদতে থাকা নানিয়ার লাল মুখটার দিকে তাকিয়েছিলাম।

ওকে কিছুটা সময় দিয়ে একে গ্লাস জল এনে ধরিয়েছিলাম ওর হাতে। তারপর বলেছিলাম, "এবার থামা কী হয়েছে বল!"

নানিয়া তখনও নিজেকে জোড়া লাগাতে পারছিল না। তাও কোনওমতে জলটা খেয়ে যা ভাঙা-ভাঙা সেনটেন্স বলছিল, তাতে বুঝেছিলাম ও সুরিন্দরকে সারপ্রাইজ দিতে ওর ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখেছে যে সুরিন্দর অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে বিছানায় শুয়ে আছে!

আমি ঘতমত খেয়ে চুপ করে গিয়েছিলাম। আরে এমন তো সিনেমায় হয়!

নানিয়া বলেছিল, "ও নিজেই আমায় ওর ফ্ল্যাটের একটা চাবি দিয়ে রেখেছিল। আমি ভাবলাম আজ শুরুবার। ওর ফ্ল্যাটে ঢুকে কিছু রান্না করে ওর জন্য ওয়েট করব। অফিস থেকে ফিরলে চমকে যাবে। কিন্তু..."

নানিয়া আবার বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে শুরু করেছিল। এবার কেন কান্নার তোড় আরও বেশি! আমি কী করব বুঝতে না পেরে আরও কাছে সরে গিয়ে হাত দিয়েছিলাম ওর। বলেছিলাম, "কাঁদিস না। প্লিজ কাঁদিস না।"

নানিয়া মুখ তুলে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তারপর কী যে হল! হঠাৎ ও সোজা বসে আমার জামার কলারটা ধরে টেনে নিয়েছিল নিজের কাছে।

আমি বুঝতে পারছিলাম নানিয়ার ঠোঁটে নোনতা চোখের জল লেগে রয়েছে!

মিনিট পনেরো পরে নানিয়া উঠে বসেছিল বিছানায়! ওর কোঁকড়া চুলগুলো ছড়িয়ে ছিল খালি শরীরের উপর। নগ্ন স্তনদুটো শ্বাসের জন্য ওঠানামা করছিল দ্রুত। আর ওই ফর্সা মুখটা গোলাপি হয়েছিল একদম! আমি খালি গায়ে একটা চাদরের ভিতর শুয়েছিলাম চুপ করে।

এটা কী হল! হঠাৎ হলই বা কেন! আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমার শ্বাসের মধ্যে নানিয়ার চুইংগামের গন্ধ আটকেছিল। বুকের ভিতর পাক খাচ্ছিল নানিয়ার ডিভডনেটের ছোট-ছোট প্রজাপতি!

নানিয়া আমার দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করেছিল একবার। তারপর চোখ খুলে বলেছিল, "সরি। রিবাউন্ড!"

তারপর থেকে নানিয়া আর আসেনি এখানে। ক্লাসেও এড়িয়ে গিয়েছে আমায়। আমিও কেন জানি না কথা বলতে পারিনি ওর সঙ্গে! ভিতরে কিসের যেন একটা অপরাধবোধ কাজ করছে আমার! সনাতন চিন্তাভাবনার মানুষ আমি। যাকে ভালবাসি তার সঙ্গে ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে ক্যাজুয়াল সেক্স করার কথা ভাবতেও পারি না। আর সেখানে এটা কী হল! আমি জানি না আর কখনও নানিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঠিক হবে কি না! কেন যে নানিয়া সেদিন অমন করল আর আমিও কেনই বা সাড়া দিলাম কে জানে! কাম কি সত্যিই ব্যাধের মতো? শিকার না শেষ করে শান্ত হয় না?

বইটা বন্ধ করে আমি বিছানায় হেলিয়ে বসলাম একটু! ভাল লাগছে না কিছু। কাঁহাতক সারাক্ষণ পড়াশোনা করা যায়! এখানে এসে এমন অবস্থায় পড়তে হবে কে জানত! এ যেন দ্বীপান্তর!

পিং করে এবার একটা শব্দ হল। আমি মোবাইলটা তুললাম। ইমেল এসেছে!

আমি খুললাম মেলটা! আর সঙ্গে-সঙ্গে বুকে ধাক্কা লাগল আমার! রাজিতা!

আমি চোখ বন্ধ করলাম একটু। কেন জানি না বুকের ভিতর আচমকা ঘোড়া ছুটছে! এমন তো হওয়ার কথা নয়! কিন্তু কেন হচ্ছে? এসব কি একা থাকার ফল?

আমি নিজেকে সংযত করে চোখ খুললাম। রোমান হরফে বাংলায় লেখা ছিট :

রিয়ান,

বড় এই চিঠিটা মনে-মনে লিখেছিলাম আরও আগে, কিন্তু সেটাকে কেটে-ছেঁটে এটুকুই পাঠালাম আজ। একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল। দোয়েল-সাঁকোটা কি সত্যি শুধু গল্পেই হয়?

রাজি।

ঠাকুরমার গল্প - ২

"বহু-বহু বছর আগে ভারতবর্ষের এক রাজ্যে বিধান নামে একটি রাখাল বালক ছিল। সাতকুলে তার এক মামা ছাড়া আর কেউ ছিল না। রোজ সকাল-বিকেল সে গোরু চরাতে মাঠে যেত। আর বিশেষ কাজকর্ম কিছু জানত না। গোরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে বিধান বড় গাছের তলায় বসে বাঁশি বাজাত।

"রোজকার মতো একদিন সে মাঠে গোরু চরাতে গেছে এমন সময় দেখে কী, আকাশ থেকে বিশাল একটা পুষ্পক রথ এসে নামল দূরের ওই দিঘিটার পাড়ে। বিধান তো অবাক! এ কী নামল আকাশ থেকে! এমন তো দেখেনি কোনও দিন! ওর কৌতূহল হল খুব। ও পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল দিঘির দিকে।

"দিঘির পাড়টা খুব সুন্দর। বড়-বড় গাছে ঢাকা। আর সেই গাছের ফাঁকে-ফাঁকে সুন্দর ছোট-ছোট ফুলের গাছ। বিধান অমন একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর খুব সাবধানে একটা ফুল গাছের ডাল সরিয়ে উঁকি দিল। আর যা দেখল, তাতে ও ঘমকে গেল একদম।

"বিধান ফুল গাছের ফাঁক দিয়ে দেখল সেই দিঘির পাড়ে বসে রয়েছে সাতটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। তারা নিজেদের মধ্যে গান গাইছে, হাসছে, গল্প করছে! বিধান তো এমন সুন্দরী কাউকে দেখেইনি কোনও দিন। ও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেই সাতটি মেয়ের দিকে। ভাবল এরা এল কোথা থেকে? এরা কারা? এখানে এসেছেই বা কেন!

"এমন সময় বিধান শুনল একটি মেয়ে অন্য একটি মেয়েকে বলছে, 'ছোট, যা তো ফুল পেড়ে আন গাছ থেকে! আমরা আজ মাথার মুকুট বানাব!'

"যেমনি কথা তেমনি কাজ। সাতজনের মধ্যেকার সবচেয়ে ছোট মেয়েটা উঠে ফুল গাছের কাছে এল। তারপর ফুল পাড়তে শুরু করল। আর বিধান একবার ভাল করে দেখল এই মেয়েটাকে! পান পাতার মতো মুখ! পাতলা নাক! টানা-টানা চোখ! ছোট্ট কপাল! এমন কাউকে তো কোনও দিন দেখেনি বিধান! ও এমন মোহিত হয়ে গেল যে ভুলেও গেল সেই মেয়েটা এসে দাঁড়িয়েছে ওর সামনের ফুল গাছটার কাছেই।

"তারপর মেয়েটা যেই গাছের ডাল সরিয়ে ফুল তুলতে গেল, তখনই ওর চোখে চোখ পড়ল বিধানের! বিধান নড়তে পারল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটাও বিধানের সামনে থেকে নড়তে পারল না! দু'জনে যেন সম্মোহনে পড়ে গেল দু'জনের!

"এদিকে ছোট বোন আসছে না দেখে বাকি ছয় দিদি উঠে এল দিঘির পাড় থেকে।

"বড় দিদি বলল, 'কী রে, তুই দেরি করছিস কেন?'

"ছোট বোন কথাই বলতে পারল না। বিধানের থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না যে!

"দিদিরা কত কিছু বলে বোনকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু কিছুতেই সফল হল না।

"তারপর বিধান জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী?'

বুকের ভিতর পাক খাচ্ছিল ন্যানিয়ার ডিভডরেন্টের ছোট-ছোট প্রজাপতি!

"মেয়েটি বলল, 'রাজিতা।'

"দিদিরা বিধানকে ভয় দেখাল। বলল, ওদের মা স্বর্গের দেবী। যদি জানতে পারে তা হলে বিধানকে এমন অভিশাপ দেবে যে ভাবতেও পারবে না।

"বিধান তাও ভয় পেল না। বরং বলল, রাজিতার জন্য ও সব কিছু করতে পারে। রাজিতাও যেন বিধানের থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। যেন মনে হচ্ছে, এই মানুষটার জন্যই ও এত দিন অপেক্ষা করছিল।

"রাজিতা ওর দিদিদের বলল, 'আমি বিধানের কাছেই থাকব। তোমরা ফিরে যাও।'

"দিদিদের তো মাথায় হাত, এ কী বলে রাজিতা! ওরা কত করে বোঝাল, মায়ের কথা বলল। কিন্তু রাজিতা শুনলই না কিছু।

"নিরুপায় হয়ে দিদিরা তখন রাজিতাকে খুব আদর করল। ওদের সঙ্গে করে আনা সব কিছু রাজিতাকে দিয়ে দিল। বলল, বিধানের সঙ্গে যেন ভাল থাকে রাজিতা। তারপর ফিরে গেল পুষ্পক রথে।

"তারপর বিধান আর রাজিতা গান্ধর্ব মতে বিয়ে করে ঘরসংসার করতে লাগল।

"কিন্তু রাজিতার মা, স্বর্গের দেবী হৈমবতী, সে তো রেগে আগুন হয়ে গেল এইসব শুনে! এটা কী করল রাজিতা! মায়ের কথা তার একবারও মনে পড়ল না! সব ছেড়ে গেল নিমেষের মধ্যে! এত সাহস! আর বিধান! কে সে! সামান্য রাখাল বই তো কিছু নয়! তা হলে! তার এত সাহস হয় কী করে! আচ্ছা, দেখা যাবে।

"হৈমবতী সঙ্গে-সঙ্গে তার সৈন্যদের জড়ো করলেন। আর বললেন, এক্ষুনি যেন তারা গিয়ে রাজিতাকে নিয়ে আসে তাঁর কাছে। আর বিধান বাধা দিলে যেন তাকে মেরে ফেলা হয়।

"সৈন্যরা দেবীর কথায় আর সময় নষ্ট না করে সঙ্গে-সঙ্গে মর্তে গিয়ে হাজির হল। ভাগ্য এমন যে বিধান তখন বাড়িতে ছিল না। রাজিতা একাই ছিল।

"সৈন্যরা রাজিতার কোনও কথাই শুনল না। তাকে জোর করে টেনে নিয়ে গেল ঘরের বাইরে। তারপর রথে তুলে রথটি চালিয়ে দিল!

"রথ যখন মাটি ছাড়ছে, ঠিক তখনই বিধান ফিরে এল মাঠের থেকে। আর দেখল রাজিতাকে তার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিধান চিৎকার করল। লোকজনকে ডাকল। সাহায্য চাইল। কিন্তু কেউ এসে সাহায্য করল না ওকে। বিধান ঝাপসা চোখে দেখল, রাজিতাকে ওর থেকে কেড়ে নিয়ে গেল একদল সৈন্য!

"বিধান তারপর থেকে পাগলের মতো হয়ে গেল। ও খায় না, মাঠে যায় না, বাঁশি বাজায় না। কিছু করে না। ক্রমশ বিধান ঘরে বন্দি করে নিল নিজেকে। ভাবল এভাবেই সব ছেড়ে ও মারা যাবে এক দিন।

"এদিকে রাজিতাও নিজেকে ঘরে বন্দি করে নিয়েছে। খায় না, গান গায় না। কারও সঙ্গে কথা বলে না। দিনে-দিনে রাজিতা এক হয়ে গেল। হৈমবতী তার উপর এমন রেগে গিয়েছিলেন যে, মেয়েকে কিছু বোঝানোর চেষ্টাই করলেন না।

"তারপর এক দিন রাতে বিধান স্বপ্ন দেখল যে স্বয়ং বিষ্ণু এসে ওকে বললেন, 'নদীর ধারে একটা বড় সবুজ পাথর আছে। সেটাকে ও একা ঠেলে সরাতে পারলে তার নিচে একটা ঝাপড় পাবে। সেটাতে বসলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধান স্বর্গে রাজিতার কাছে যেতে পারবে।'

"বিধান সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে আর সময় নষ্ট না করে নদীর পারে চলে গেল। ওই তো বড় সবুজ পাথর। বিধান পাথরটা দেখে খুশি হলেও সঙ্গে-সঙ্গে চিন্তিতও হয়ে পড়ল। এত বড় পাথরকে কীভাবে একা-একা সরাবে? কিন্তু চেষ্টা তো করতেই হবে। না হলে রাজিতা যে দুঃখে থেকে যাবে সারা জীবন।

"বিধান চেষ্টা শুরু করল। দিনের পর-দিন গেল। মাস ঘুরে গেল বছরে। বিধান চেষ্টা করতে লাগল। তারপর একদিন ঠিক মন আর শরীরের জোরে ও সরিয়ে ফেলল পাথরটাকে। আর কী অবাক, ঠিক খুঁজে পেল সেই কাপড়!

"বিধান আর সময় নষ্ট না করে সঙ্গে-সঙ্গে চড়ে বসল সেই কাপড়ে। আর কাপড়টা ওকে উড়িয়ে নিয়ে চলল আকাশে, স্বর্গের পথে!

"এদিকে দেবী হৈমবতী তো খবর পেয়ে গিয়েছেন যে, বিধান আসছে তাঁর মেয়েকে নিয়ে যেতে! এখন কী হবে? বিষ্ণুর বরে বলীয়ান বিধান! ওকে কী করে আটকাবেন?

"উপায় আছে! হৈমবতীর মনে পড়ল। তাঁরও একটা ক্ষমতা আছে। তাঁর চুলের কাঁটা দিয়ে টানা রেখা লঙ্ঘন করার ক্ষমতা নেই কারও! এমনকী, স্বয়ং বিষ্ণুও সে ব্যাপারে অক্ষম!

"হৈমবতী সঙ্গে-সঙ্গে চুলের কাঁটা খুলে আকাশে বিশাল বড় একটা রেখা টেনে দিলেন। আর আকাশপথে আসা বিধান আটকে গেল সেই রেখার ওপারে। আর অন্য পারে বিধানের অপেক্ষায় বসে রইল রাজিতা!

"এই রেখা আর কিছু নয়। এই হল আকাশগঙ্গা! যার দুই পারে বসে দুই বিরহী! রাজিতা আর বিধান!

"মনের যন্ত্রণায় রাজিতা খুব কাঁদে। সারা দিন, সারা মাস, সারা বছর কেঁদে চলে রাজিতা। আর ওর কান্না শুনে বছরের সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে পৃথিবীর সমস্ত দোয়েল পাখি উড়ে যায় আকাশে। তারপর একে অন্যের সঙ্গে ডানায় ডানা বেঁধে আকাশগঙ্গার উপর তৈরি করে এক সাঁকো। যাতে সেই সাঁকো পেরিয়ে বিধান এসে পৌঁছতে পারে তার রাজিতার কাছে।"

"তারপর?" রাজিতা বড়-বড় চোখ করে তাকাল ঠাকুরমার দিকে।

"পারল বিধান রাজিতার কাছে পৌঁছতে?"

ঠাকুরমা শ্বাস নিল বড় করে। তারপর বলল, "আমি জানি না রে।"

"এটাও জানো না!" রাজিতা মুখ গোমড়া করে তাকাল ঠাকুরমার দিকে, "বলো না কী হল তারপর? বিধান পারল রাজিতার কাছে যেতে?"

ঠাকুরমা এবার রাজিতার পাশে বসা রিয়ানের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর ধীরে-ধীরে জিজ্ঞেস করল, "তোর কি মনে হয় রিয়ান, পারল?"

নয়

রাজিতা

রাজিতা বলে কোনও দেবতার মেয়ে ছিল না কোনওদিন। ওর বাবা বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা পেপার মিলের অসুস্থ ফোরম্যান। মা ঘরের দেওয়ালের মধ্যে দম বন্ধ করে বসে থাকা এক ভাঙা পরি। রাজিতার জীবনে কোনও রূপকথা নেই। কোনও পুষ্পক রথ, রাজপ্রাসাদ বা আকাশগঙ্গা পেরিয়ে কারও কাছে আসার গল্প নেই! পৃথিবীর সমস্ত দোয়েল পাখি ওর জন্য ডানায় ডানা জুড়ে সাঁকো তৈরি করে না। শুধু ওই ছোট্ট নুনকুম করা ঘরটুকুর মধ্যেই ওর গুরুত্ব। ওর অস্তিত্ব।

আর এ শুধু আমার নয়, এই শহরের বেশির ভাগ মানুষের এটাই গল্প। এখানে কেউই যেন কারও কাছে জরুরি নয়। সবাই হাসছে, আসলে কিন্তু হাসছে না! সবাই কথা বলছে, কিন্তু কারওরই যেন শব্দ বেরোচ্ছে না মুখ থেকে। সোশ্যাল সাইটে সবাই নিজের হাসিমুখি আর দলবদ্ধ ছবি টাঙিয়ে রাখছে। কিন্তু সবাই কেমন যেন নির্বান্ধব। একা। ভয়ার্ত! যা নেই, তাই হারিয়ে ফেলার আতঙ্ক সবার চোখে-মুখে। যে কোনও দিন ভালবাসল না, তাকে ছেড়ে থাকার কষ্ট সবার মনে। যে আর আসবেই না তার জন্যই যেন সবাই আয়োজন সাজিয়ে বসে রয়েছে সারাজীবন! সবাই সবার থেকে বিচ্ছিন্ন! যেন কিছু পুরনো কলকাতার বাড়ি! তাদের কারও কোনও দোয়েল-সাঁকো নেই!

আমি বাসের জানালা দিয়ে তাকালাম। এস্প্লানেড মোড়ের কাছে আটকে রয়েছে বড় বাসটা। সামনে গাড়ি-ঘোড়ার অনন্ত জট।

ঘড়ি দেখলাম। বিকেল নেমে আসছে শহরে। ঘোলাটে গঙ্গাজলের মতো আকাশ! আকাশে বিষের কণা উড়ছে!

দুর্গাপুজো থেকে কালীপুজোর মাঝখানের এই সময়টা যেন এক অদ্ভুত লোডশেডিং! বলমলে শহরটা হঠাৎ কেমন যেন অন্ধকার হয়ে যায়। খুলে নেওয়া বাঁশ আর পিচের উপর রংচটা আলপনা যেন মনে করায় কোনও পূর্বজন্মের স্মৃতিকে। সবাই যেন আচমকা একটু কুঁজো হয়ে যায়। যেন একটু রুপোলি হয়ে যায়!

আমারও এই সময়টা মনখারাপ করে। দুর্গাপুজো খুব ভাল লাগে আমার। ছোটবেলায় বাবা, মা, ভাই আর রিয়ানদের সঙ্গে ঘুরতে বেরোতাম। সারাটা পথ রিয়ান মুখ গোমড়া করে থাকলেও আমার ভাল লাগত খুব। মনে হত মুখ ভার করেছে তো কী হয়েছে! রিয়ান তো আছে আমার সঙ্গেই!

কিন্তু তারপর হঠাৎ কেমন যেন সব ভেঙে গেল! কাকু থাকল না। আর রিয়ানও কেমন যেন গুটিয়ে গেল খোলসের মধ্যে! তারপর থেকে পুজোতে আর বেরোত না রিয়ান। আমায় নিয়ে বাবা-মা বেরোলেও আমার ঘুরতে ইচ্ছে করত না একটুও। কেবলই রিয়ানের মুখটা মনে পড়ত। তাই এতও বড় হওয়ার পর আমি নিজেই চলে যেতাম ওর কাছে। সারাটা দিন কাটাতাম ওদের বাড়িতে। তারপর বিকেলে ফিরে আসতাম।

প্রশ্ন করত রিয়ান। মাঝে-মাঝেই বলত কেন আমি আসি। কেন এতই যখন ঘোরে, আমি এভাবে সময় নষ্ট করি!

আমার হাসি পেত! 'নষ্ট' শব্দটার কানসেপ্ট এক-একজনের কাছে এক-এক রকম।

এখন আর হাসি পায় না আমার। বরং সারাক্ষণ কেমন যেন একটা কষ্ট আচ্ছন্ন করে রাখে আমায়। মনে হয় সারাক্ষণ মনের আবহে কে যেন বেহালা বাজিয়ে চলেছে! অন্ধকার এক পাড়া যেন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে আমার মনের মধ্যে। সেই পাড়ায় ছোট-ছোট মেঘলা রঙের বাড়িঘর। চায়ের লিকারের মতো ল্যাম্পপোস্ট। দুধের সরের মতো ধোঁয়ার আস্তরণ! সেই পাড়ার ছোট্ট কোনও এক চিলেকোঠা থেকে নাম না জানা কোনও মানুষ যেন বাজিয়ে চলেছে সেই বেহালা! আর তার কুচি-কুচি সুরের টুকরো টুপটাপ করে খসে পড়ছে আমার মনের ভিতর! ক্রমশ সেই ভাঙা, আধ-ভাঙা সুরগুলো ভরিয়ে তুলছে আমায়। আর সমস্ত কিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছে!

আমি জানতাম এমনটাই হবে। রিয়ানও বলেছিল একবার সেই কথাটা। বলেছিল, "তোর কপালে দুঃখ আছে রাজি। ডোন্ট ষ্টাইভ ফর দ্য ইমপসিবল।"

তখন দু'জনে সবে ভর্তি হয়েছি কলেজে। একই ষ্ট্রিম। একই কলেজ।

ভর্তির দু'সপ্তাহের মধ্যে বিনাজল বলে একটি ছেলে আমার পিছনে পড়ে গিয়েছিল। ছেলেটা লম্বা। ছিপছিপে। ভাল ক্রিকেট খেলত। উচ্চমাধ্যমিকে ফিফথ হয়েছিল। সবাই বলত এমন ছেলে আর হয় না!

আমি যেখানে যেতাম, বিনাজল আমার পিছন-পিছন যেত। ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। এমনকী, ক্যান্টিনেও আমার টেবিলে এসে বসত।

আমার ভাল লাগত না একটুও। সবাই বলত, ভাল ছেলে! বলত, আমার ভাগ্য নাকি খুব ভাল। কিন্তু আমার এসবে বিরক্ত লাগত। আর সবচেয়ে কষ্ট হত এটা ভেবে যে, রিয়ানের এতে কোনও তাপ-উত্তাপ ছিল না। সবাই যে সিনেমা দেখছে এমন একটা ইনার্ট দূরত্ব থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখত।

তারপর একদিন খুব বৃষ্টি হল কলকাতায়। সুকিয়া স্ট্রিট থেকে ঠনঠনে অবধি ডুবে গেল জলের তলায়। আমি ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, সারা শহরটাই বৃষ্টির চিকের আড়ালে চলে গিয়েছে। কলেজ যাওয়া যাবে না।

কব্বির কাপ হাতে নিয়ে আমি তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম সাঁকোর থেকে কীভাবে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়ছে নিচে। আর তখনই দেখেছিলাম বিনাঞ্জনকে। আমার হাত থেকে কব্বির কাপটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল নিচে। এখানে কী করছে ও! বাড়িতে আসবে নিশ্চয়ই! মা যদি দেখে, তবে তো আর অশান্তির শেষ রাখবে না!

একটা ছোট্ট ছাতা নিয়ে আমি দ্রুত নেমে গিয়েছিলাম। জেঠিমা অবাক হয়ে আমায় দেখেছিল। জিজ্ঞেস করার চেষ্টাও করেছিল কী করছি আমি এই বৃষ্টিতে! উত্তর দিইনি।

বিনাঞ্জন দাঁড়িয়েছিল গলির একপাশে। গায়ে ওয়াটার প্রুফ। হাতে প্লাস্টিকে মোড়ানো একটা ফুলের বোকে! আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ওর সামনে।

"হাই!" বিনাঞ্জন নার্ভাসভাবে হেসেছিল আমার দিকে তাকিয়ে।

"এখানে কী করছিস তুই?" আমি দ্রুত আমাদের বাড়ির দোতলার ব্যালকনির দিকে তাকিয়েছিলাম। মা দেখছে না তো!

বিনাঞ্জন তাকিয়েছিল আমার দিকে। ওর চশমার কাচে বৃষ্টির গুঁড়ো এসে লাগছিল। তার মধ্যে দিয়েও বুঝতে পারছিলাম ওর চোখের দৃষ্টিটা আজ আরও পালটে গিয়েছে।

"কী রে?" আমি তাড়া দিয়েছিলাম।

বিনাঞ্জন সময় নিয়েছিল একটু। তারপর বলেছিল, "এমন বৃষ্টির সকালে ঘুম থেকে উঠেই একটা প্রশ্ন এসেছিল আমার মনে।"

"কী?" টেনশনে আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

"ফুলকে দোটায় যে-শক্তি! শিশিরকে পদ্ম পাতায় ধরে রাখে যে-শক্তি! যে-শক্তি ফুটপাথেকে ছোট্ট বাচ্চাকেও বাঁচিয়ে রাখে শত কষ্টের ভিতর! একটা নক্ষত্রকে আর-একটার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়! বিশাল সূর্যকে নিভিয়ে দেয় এক ফুঁয়ে! নেবুলার পেটে কোটি কোটি তারার জন্ম দেয়! সেই শক্তিই কি আমায় তোর থেকে দূরে সরিয়ে রাখে?"

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না।

বিনাঞ্জন ফুলটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, "ক্যান দিস ফ্লাওয়ারস্ প্রিজ দ্য গ্ল্যাণ্ড লেট্স বিন বি দ্য ক্যাটালিস্ট! প্লিজ!"

বিনাঞ্জন আর কিচ্ছু বলেনি। চলে গিয়েছিল। পিছনে ঘুরে তাকায়নি একবারও। আমি সেই বৃষ্টির মধ্যে ফুল হাতে ধরে দাঁড়িয়েছিলাম শুধু।

পরের দিন রিয়ানকে আলাদা করে নিয়ে গিয়েছিলাম কলেজ মাঠের একপাশে। ও একটু অবাক আর বিরক্ত হয়ে বলেছিল, "কী করছিস?"

আমি বলেছিলাম, "তোকে একটা কথা বলার ছিল!"

"কী? তোর হাতে এডস রোগের ওষুধের ফরমুলা এসে গিয়েছে?"

আমি ধমকও খেয়েছিলাম একটু, "মানে!"

"এমন কী হল যে মাঠের কোনায় টেনে আনলি? গোপন কথা থাকলে ফোনে বলতে পারতিস!"

"না, ফোনে বলা যায় না," আমি মাটিতে জুতো দিয়ে আঁচড় কেটেছিলাম।

রিয়ান তাকিয়েছিল আমার দিকে। তারপর বলেছিল, "বিনাঞ্জন তোকে সোজাসুজি প্রোপোজ করেছে তো?"

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে, "তুই... মানে..."

রিয়ান সোজা তাকিয়েছিল আমার দিকে। ভাবলেশহীন মুখে বলেছিল, "ডোণ্ট প্রিটেন্ড যে তুই জানতিস না এটা আসছে।"

আমি বলেছিলাম, "বুঝতে পারনি যে ও বাড়িতে আসবে।"

"ভেবেছিলি শুধু বলেজেই ও ক্যাম্পেন করবে!"

আমি ছটফট করে বলেছিলাম, "কেন এমন করে ও?"

"ন্যাকামি করিস না রাজি। তুই জানিস তুই কত সুন্দর! বাদ দে, আমায় কেন এখানে ডাকলি?"

আমি সুন্দর! রিয়ান বলল! সব কথা ভুলে আমার মনের মধ্যে ওই একটা ছোট্ট বাক্য প্রজাপতির মতো উড়তে শুরু করেছিল।

রিয়ান কড়া গলায় বলেছিল, "কনসেনট্রেট অন রাইট ওয়ার্ডস। কী চাস?"

"তুই বল আমি কী করব?"

"তোর বিনাঞ্জনকে চুমু খেতে ইচ্ছে হলে খা। রিজেক্ট করতে ইচ্ছে হলে কর। আমার এ ব্যাপারে কোনও লাইক, কমেন্ট, শেয়ার বা ট্যাগ নেই।"

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম রিয়ানের বাদামি চোখের দিকে। ওর খাঁজ কাটা থুতনি। হালকা দাড়ি। কপালের উপর এসে পড়া কোঁকড়া চুল কেমন যেন অচেনা মনে হচ্ছিল।

রিয়ান বলেছিল, "তুই লাই দিয়েছিস, এখন তুই সামলা। আমায় বলছিস কেন?"

"তোকে বলব না?" আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম রিয়ানের দিকে।

রিয়ান বলেছিল, "তোর কপালে দুঃখ আছে রাজি। ডোন্ট ষ্টাইড ফর দ্য ইমপসিবল।"

আমি তাও বলেছিলাম, "তুই বল না, আমি কী করব?"

রিয়ান মুখ নামিয়ে চলে গিয়েছিল কোনও উত্তর না দিয়ে।

রিয়ান পালটায়নি আজও। আজও নিজের ইচ্ছে হলে কথা বলে। না হলে নয়। আমি আর থাকতে না পেরে কিছু দিন আগে একটা ছোট্ট ইমেল পাঠিয়েছিলাম ওকে। ও উত্তর দেয়নি। জানি না ও কী মনে করে আমায়। কেন আমায় এত কষ্ট দেয়! আমি কী এমন বলেছি যেটা ও জানত না। কী এমন করেছি যেটা ও আঁচ করেনি! ও কি আমায় ভুলতে চায়? তাই কি প্রায় আড়াই মাস আমার সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ করেনি?

আমার মনের ভিতরে তাই বেহালা বাজে আজকাল! সেই ছোট্ট চিলেকোঠার থেকে ভেসে আসা বেহালা! বাবার শরীর খারাপ। বাড়িতে অর্থনৈতিক সমস্যা। এইসব কিছু ছাপিয়ে কেন জানি না রিয়ানের হারিয়ে যাওয়াটাই আমায় বেশি করে কষ্ট দেয়। মনে হয় এ পৃথিবী একটা বাতিল জিনিসপত্রে ভর্তি ঘর! এখানে কিছু হারিয়ে গেলে তা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যে একবার মিশে যায় এর অন্ধকার 'হ্যাঁ'-এর ভিতর, তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না! মনে হয় আসলে এত দিন রিয়ান বলে কেউ ছিলই না! দোয়েল পাখিরা কোনও দিন উড়তেই পারে না এ পৃথিবীতে!

আমার এখন আপশোস হয়, কেন আমি ওই ইমেলটা পাঠিয়েছিলাম রিয়ানকে। কাছে থেকেই যে অমন করতে পারে, দূরে গেলে তো সে আরওই সরে যাবে। তা ছাড়া আমেরিকা তো শুনি এল ডোরাডো। সেখানে গেলে নাকি জীবন পালটে যায়! রিয়ানেরও গিয়েছে নিশ্চয়ই! তা ছাড়া ওই বান্ধবী আছে যে। নানিয়া ধীলোঁ!

আচমকা বাসের ভিড়টাকে আমার অসহ্য মনে হল। মনে হল নেমে যাই। এখান থেকে হেঁটে ভবানীপুর চলে যাই। মনে হচ্ছে চারিদিক থেকে আমাকে যেন গিলতে আসছে এই ভিড়টা! কিন্তু তারপরেই মনে হল, কেন যাব ভবানীপুর? কাকিমা ডেকেছে বলেই যেতে হবে? কাকিমার দাবা কোনও এক স্কুলে চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন বলেই যেতে হবে? সবাই আমায় চাকরি দেখিয়ে কিনে নিতে চায়?

কিন্তু আমি জানি এসব ভাবতে নেই। আমার যা জীবন তাতে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের জায়গা নেই আর। আমি কোনও দিনও নিজের দিকটা দেখিনি। আজও দেখব না।

তাও আমার খুব কষ্ট হয় আজকাল। ভবানীপুরের ওই বাড়িটার এক তলায় ছড়িয়ে আছে আমার বড় হয়ে ওঠা। আছে রিয়ানের সঙ্গে কাটানো অসংখ্য মুহূর্ত। ওই বারান্দা, ওর ঘরের স্পাইডারম্যানের পোস্টার, দেওয়ালের কু কু ক্লক, ওর রুপোর চামচ, ছোটবেলার গিটার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সব কিছুর সঙ্গেই যেন কুয়াশার মতো জড়িয়ে আছে অজস্র স্মৃতি। কেন সেইসব নিষ্প্রাণ জিনিসেরও অত্যাচার সহ্য করতে হবে আমায়! কী অপরাধ আমার?

বাসটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। আমার ভুল হয়েছে। কিছুটা দূরে এসে আমার মেট্রো ধরা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা না করে এই বাস ধরেই বিপদে পড়েছি!

আসলে আজ একটা অফিসে গিয়েছিলাম ইন্টারভিউয়ের জন্য। আকাশের সূত্রে খবরটা পেয়েছিলাম কয়েক দিন আগে।

অফিসটা রিয়ালদার কাছে। ওদের সুতোর কারখানা আছে। অফিসের জন্য মেয়ে খুঁজছে ওরা। ইন্টারভিউ ভালই হয়েছে। কিন্তু জানি না কতটা কাজ হবে। আসলে আমার মনে হল ওরা কতকটা আকাশের অনুরোধেই যেন ঢেঁকি গিলেছে!

সেদিন আকাশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার পর ও আমায় অফিস থেকে চলে যেতে দেয়নি। সেই যে বলেছিল, "সুজাতাদি ঠিক বলেছে। আপনি সত্যি অদ্ভুত!" তারপর অফিসের মধ্যে সামান্য কথাবার্তা হয়েছিল আমাদের মধ্যে!

ও বলেছিল, "দেখুন, যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তিনি নেই। তবে আই ক্যান হেল্প ইউ।"

আমি কিছুটা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলাম। সারাজীবন ধরে ছেলেদের গায়ে পড়ে উপকার করার অভ্যেসটা আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি।

আকাশ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "আপনি আমায় দশ মিনিট সময় দেবেন? প্লিজ!"

আমরা অফিসের বাইরে বেরিয়ে একটা কফিশপে গিয়ে বসেছিলাম। এসব জায়গায় আমি চট করে ঢুকি না। এক কাপ কফির দামে আমাদের দু'দিনের মাছ হয়ে যায়!

আকাশ দু'কাপ কফি বলে আমার দিকে তাকিয়েছিল, "দেখুন, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু পাইল অন। কিন্তু সুজাতাদি আমার জন্য খুব চিন্তিত। আমি জানি সুজাতাদি কী চাইছে। আমাকেও বলেছে। খুব এমব্যারেসিং ব্যাপার আপনার জন্য। আপনি কেন শুধু-মুধু একজন ডিভোর্সি ছেলের সঙ্গে নিজেকে জড়াবেন! আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট।"

কথাটা বলে আকাশ একটু থেমে তাকিয়েছিল আমার দিকে। ও ভেবেছিল যে ওর এই কথাটার ভেতরকার হালকা সেন্টিমেন্টাল ভাবটাকে আমি 'না, না, তা নয়' বলে কাউন্টার করব? আমি কাউন্টার করিনি। কিছু বলিনি। কেন বলব!

আকাশ নিজের হতাশাটা বুঝিয়ে নিয়ে বলেছিল, "আমি আপনাকে আমার অফিসে কর অফার করছি না। আমি আপনাকে কয়েকটা রেফারেন্স দেব। আপনি নক করতে পারেন।"

আমি কী বলব বুঝতে পারিনি।

আকাশ আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে ছিল কিছুক্ষণ। তারপর আমতা-আমতা করে বলেছিল, "আসলে আমি আপনার সঙ্গে কথাও বলতে চাইছিলাম আলাদা করে। একটা জরুরি কথা বলার ছিল।"

"আমার সঙ্গে!" আমি এই প্রথম অবাক হয়েছিলাম।

আকাশ বলেছিল, "আমার মা টারমিনালি ইল। আমি এক ছেলে। আসলে আমার ডিভোর্স হওয়ার পর থেকে মা খুব ভেঙে পড়েছে। এখন মা চায় আমায় বিয়ে দিতে। আমার আপনাকে পছন্দ হয়েছে। কিন্তু মনে করবেন না। কিন্তু সত্যি কথাটা সহজভাবে বলাই ভাল। তাই আপনি যদি..."

আমি বলেছিলাম, "একইসঙ্গে চাকরি আর বিয়ে! আমি কনফিউজড হচ্ছি, নাকি আপনি?"

আকাশ থমকে গিয়েছিল একটু। তারপর বলেছিল, "জানি খুব অভ লাগছে আপনার। জানা নেই চেনা নেই, হঠাৎ এমন প্রস্তাব!"

"হ্যাঁ, তা লাগছে।"

"কিন্তু সুজিদি আপনার সম্বন্ধে আমায় বলেছেন সব। আমি তো সেদিন আপনাদের ওখানে গিয়ে দেখলামও আপনাকে। আমি খারাপ মানুষ নই। একটি মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম, কিন্তু সে আমায় ভালবাসেনি। ছেড়ে গেছে। আই ওয়াজ স্যাড। কিন্তু আর নই। তবে মা আমায় বিয়ের জন্য কিছু বলেনি। কিন্তু আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি এখুনি কিছু বলছি না আপনাকে। কিন্তু আপনি প্লিজ একটু ভেবে দেখবেন। আমি জানি না আপনার রফতেক আছে কি না! মানে সুজিদি সেসব কিছু বলেনি আমায়। কিন্তু আপনি জানবেন আমি আপনাকে কষ্টে রাখব না," কথাগুলো এক নিশ্বাসে শেষ করতে-করতে আকাশের সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। আগেও লোকজন আমায় প্রোপোজ করেছে। কিন্তু এমন সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব কেউ দেয়নি!

আমার রাগ হচ্ছিল সুজাতাদির উপর। আমি ভেবেছিলাম আকাশকে বলে নিই রিয়ান সম্পর্কে। কিন্তু তারপর মনে হয়েছিল, কেন বলব! যে, ছেলে আমাকে পৌঁছে না! যে আমায় ভুলে গিয়েছে তার কথা কেন বলব?

আমি বলেছিলাম, "আমার খুব অদ্ভুত লাগছে! মানে..."

আকাশ বলেছিল, "আমি মন খাই না। একটু-আধটু শ্মোক করি। ব্যস। আর কোনও নেশা নেই। আমি ব্যালেন্সড মানুষ। বাবা, মা আর আমি। এই তিনজনের সংসার। আপনার আমার বাবা-মাকে ভাল লাগবে। একদিন আমাদের বাড়িতে আসুন।"

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এ এমন করে গায়ে পড়ছে কেন?

আকাশ বুঝেছিল আমার কথা। সামনে দিয়ে যাওয়া কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলেছিল, "আপনি আমায় ডেসপেট ভাবছেন হয়তো। সত্যি আমি আ বিট ডেসপারেট। প্রেম করে ঘুরে-ঘারে বিয়ে করার সময় আমার নেই। সুজিদি জানে আমার অবস্থা কেমন। তাই আপনাকে বলেছিল আমার কথা। আপনি যদি একটু ভাবেন! না হয় অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ করুন। সেটাকে আমি লাভে কনভার্ট করে দেব। তবে এটাও মাথায় রাখবেন এর সঙ্গে চাকরির কিন্তু কোনও যোগাযোগ নেই। আর আপনি যদি আমায় বারণও করে দেন, দেবেন। তবে প্লিজ একবার সবটা ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন।"

আমি কিছু বলিনি সেদিন। আসলে আচমকা এমন আষাঢ়ে প্রস্তাব দিলেও ভঙ্গিটা এমন ভদ্র ছিল যে, আমি কিছু বলতে পারিনি। আমাদের বুঝি সবার জীবনের কমপালশনগুলো তো আলাদা-আলাদা হয়। তাই মানুষের আচরণও আলাদা হয়।

সেদিন আমার কাছ থেকে মোবাইল নাম্বার নিয়েছিল আকাশ। তারপর কয়েকদিন আগে এই চাকরির ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারটা বলেছিল। না, ইন্টারভিউয়ের কথাটা বলার সময় কিন্তু আকাশ একবারও ওই প্রস্তাবটার কথা আর তোলেনি। শুধু ছোট করে কাজের কথা বলে ফোনটা কেটে দিয়েছিল।

ভবানীপুরে নেমে দেখলাম আশপাশে পুরো অন্ধকার! এমনিতেই সন্ধে হয়ে গিয়েছে, তার উপর এমন অন্ধকার! মনে হল যুদ্ধের শহরে পৌঁছে গেলাম যেন! কালোর মধ্যে কালো দিয়ে আঁকা সব ছবি যেন আমার সামনে দিয়ে হাঁটছে।

বড় রাস্তা থেকে রিয়ানদের বাড়ি হেঁটে পাঁচ মিনিট। কিন্তু বড় রাস্তার ঝাঁ চকচকে কলকাতার থেকে ওই পাঁচ মিনিট দূরত্বেই যে এমন একটা পুরনো কলকাতা আছে সেটা ভাবলেই অবাক লাগে!

পুরনো চুন-সুরকির গাঁথনি। পাতলা ইট। ঝরোকা। কাঠের বারান্দা। ঢালাই লোহার রেলিং। কাঠের কড়ি বরগা। আমার কলেজ স্ট্রিটের একটা ছোট্ট রেপ্লিকা যেন ভবানীপুরের এই পাড়াটায় এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পাড়াটাও ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে আছে। বুঝলাম কোথাও একটা লোকাল ফল্ট হয়েছে। আমি দরজার কড়া ধরে নাড়ালাম।

কিন্তু দেখলাম দরজাটা খুলে গেল! এ কী, দরজাটা খোলা কেন! আমি ঘাবড়ে গেলাম একটু। আমি ভিতরে ঢুকে 'কাকিমা' বলে জোরে ডাকলাম। কিন্তু কোনও উত্তর নেই!

আমি ভয় পেয়ে গেলাম আরও। হলটা কী! আমি আন্দাজে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দাজে এগোলাম একটু। আর তখনই দেখতে পেলাম আলোটা। হালকা, নীলচে। এমার্জেন্সি লাইট। আমি দ্রুত এগিয়ে গেলাম। আর দেখলাম বড় চেয়ারটায় বসে আছে কাকিমা। আবছা আলোতেও বোঝা যাচ্ছে কাকিমার চোখ জলে! মাথার চুল উশকো খুশকো!

আমি এগিয়ে গিয়ে বসলাম কাকিমার পায়ের কাছে, "কাকিমা, ও কাকিমা! সদর দরজা খোলা! তুমি এখানে এভাবে কেন বসে? কী হয়েছে?"

কাকিমা তাকাল আমার দিকে। চোখে বেভুল দৃষ্টি! বলল, "দরজা খোলা! ও! আসলে...আসলে...আমি...আমার..."

আমি কাকিমার হাতটা ধরলাম, "কী হয়েছে বলো প্লিজ!"

"রিয়ান... রিয়ানকে..." কাকিমার গলাটা কেঁপে গেল হঠাৎ।

আমার পিঠ দিয়ে বরফের শিরশিটি নেমে গেল দ্রুত। আমি কাকিমার হাতে চাপ দিলাম জোরে, "আরে, কী হয়েছে বলো প্লিজ!"

কাকিমা আবছা গলায় বলল, "সামু কোন করেছিল। ওকে... ওকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে!"

দশ

রিয়ান

দোয়েল-সাঁকো! রাজিদের বাড়ির উলটোদিকে থাকত রানিঠাকুরমা। ছোটবেলায় বেশ কয়েকবার আমি রাজির সঙ্গে ঠাকুরমার কাছে গিয়েছি। ভাল লাগত যেতে। ঠাকুরমা খুব সুন্দর গল্প বলত। এত গল্প কোথা থেকে জেনেছে ঠাকুরমা আমি জানি না। জিজ্ঞেস করলে বলত, "এসব আপনা থেকেই জেনে গেছি!"

আর একটা ব্যাপার দেখতাম। ঠাকুরমার সব গল্পের নায়িকার নাম হত রাজিতা! ছোটবেলায় এই ব্যাপারটায় আমার খুব রাগ হত। কেন সব সময় নায়িকার নাম রাজিতা হবে? আমার নামে তো ঠাকুরমা কখনও কোনও গল্প বলে না! তবে এই নিয়ে আমি কিছু বলতাম না। কিন্তু রাজি বলত। বলত, "ঠাকুরমা, রিয়ানকে হিরো বানিয়ে তুমি একটা গল্প বলো। আমার শুনতে ইচ্ছে করে!"

রাজির এই ব্যাপারটা ভাল লাগত না আমার। ও কেন বারবার আমায় সমর্থন করে? কেন সবার কাছে আমার হয়ে কথা বলে! ঠাকুরমার ইচ্ছে করত না তাই আমায় নিয়ে গল্প বানাত না। তাতে রাজির কী!

তাও রাজি ছাড়ত না। ঠাকুরমার কাছে বলেই যেত যেন ঠাকুরমা আমায় নায়ক বানিয়ে কিছু একটা গল্প বলে!

ঠাকুরমা শুধু হাসত আর বলত, "ওকে তো আগে জীবনের নায়ক হয়ে উঠতে হবে, তারপর তো ওকে নিয়ে গল্প বলব!"

আমি জানি না রাজি কী করেছে যে ও ছোট থেকেই নায়িকা হয়ে গিয়েছে! তখন এই নিয়ে খুব হিংসে হত আমার। মনে হত আর কোনও দিন যাব না ঠাকুরমার কাছে। কিন্তু তাও ওদের বাড়ি গেলে গল্পের লোভে মাঝে-মাঝে ঠাকুরমার কাছে যেতাম।

ছোটবেলার সেই হিংসের কথা মনে পড়লে হাসি পায়। আর সত্যি বলতে কী এখন কেমন যেন মিস করি ঠাকুরমার ওই সব গল্প!

কয়েক সপ্তাহ আগে পাওয়া রাজির ওই ইমেলটা আমায় যেন আবার মনে করিয়ে দিয়েছে ঠাকুরমাকে। আর কেন জানি না বুকের ভিতর খচখচ করছে তারপর থেকে! খালি মনে হচ্ছে ঠাকুরমাই ঠিক চিনেছিল আমায়! আমি সত্যি 'নায়ক' নই!

দোয়েল-সাঁকো! রিজ অব ম্যাগপাইজ! দোয়েল কি ম্যাগপাই? জানি না। ঠাকুরমা কিন্তু তাই বলত।

যাই হোক, ঠাকুরমার কাছে এক গরমের ছুটির দুপুরে বসে আমি আর রাজি শুনেছিলাম গল্পটা! অদ্ভুত এক ভালবাসার গল্প!

পরে জেনেছি মিঙ্কি ওয়ের দুই পাশের দুই নক্ষত্র অলটেয়ার আর ভেগাকে নিয়ে আড়াই হাজার বছরেরও বেশি পুরনো একটা চিনা রূপকথা আছে। ঠাকুরমা সেটাই ঘুরিয়ে রাজিতার নামে বলেছিল। অলটেয়ার আর ভেগা দু'জন দু'জনকে ভালবাসলেও মিলিত হতে পারে না। তাই তাদের কষ্ট! তাদের চোখে জল! আর তাদের কান্না শুনে বছরের সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে পৃথিবীর সমস্ত ম্যাগপাই আকাশে উঠে ওই মিঙ্কি ওয়ের উপর ডানায় ডানা জুড়ে একটা সাঁকো তৈরি করে, যাতে অলটেয়ার আর ভেগা মিলিত হতে পারে!

রাজির খুব পছন্দ ছিল গল্পটা। ঠাকুরমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলত, "বারান্দার এদিকটা রিয়ান তোর আর ওই দিকটা আমার। মাঝের রাস্তাটা হল মিঙ্কি ওয়ে। আর দু'বাড়ির মাঝের এই লোহার সাঁকোটা..."

গল্পে হলেও বাস্তবে কি দোয়েল-সাঁকো বলে কিছু হয়? আমাদের মধ্যে কোন দোয়েল-সাঁকোর কথা বলেছে রাজি?

আমি দীর্ঘশ্বাস চেপে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। এসএমইউ শাটলটা একটা স্টপে দাঁড়িয়েছে। আমি ঘড়ি দেখলাম। সকাল সাড়ে দশটা বাজে।

আজ বাইরে হাওয়া দিচ্ছে বেশ। রোদ থাকলেও একটা মিষ্টি হাওয়াও আছে। টেক্সাসের সেই বিখ্যাত গরমটা এই নভেম্বরের মাঝে আর ততটা নেই। দিন ছোট হয়ে এসেছে। ফাঁকা শহরটাকে আমার কেন জানি না আরও ফাঁকা লাগছে!

আজ শনিবার। কলেজ ছুটি। কিন্তু আমি যাচ্ছি নেমন্তন্নে। আমার সেই বছর পঞ্চাশের সহপাঠী টম গ্রে আমায় তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছে।

ভদ্রলোক খুবই ভাল। মধ্যবয়স্ক মানুষ যে এমন বাচ্চাদের মতো হতে পারে আমি ভাবতে পারিনি। টমের সঙ্গে কথা বলার সময় আমার মনে হয় আমি টমের ঠাকুরদাদা হয়তো!

একটা লোক সারাক্ষণ এমন খুশি থাকে কী করে? জিজ্ঞেস করলে বলে, "গম্ভীর থাকলে সব সমস্যা মিটে যাবে? উড ইট হেল্প?"

আমি নার্সিংহোমে ভর্তি হলাম বলে টমের দেওয়া ধ্যাঙ্কস গিভিংয়ের নেমন্তন্নটা মিস করেছি। তাই সুস্থ হয়ে বাড়িতে আসার পর টম নিজে বাড়িতে এসে আমায় নেমন্তন্ন করে গিয়েছে!

আমি তো অবাক হয়ে গিয়েছিলাম খুব! আরে, এমন কেউ করে নাকি? এখানের মানুষজন খুব ভাল হলেও একটা অদ্ভুত কায়দে পার্টিশন তুলে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখে অন্যের সঙ্গে! ব্যক্তিস্বাতন্ত্রো বিশ্বাসী একটা দেশ। এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। তাই টমকে এমন করে আমার কাছে এসে নেমন্তন্ন করতে দেখে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

টম হেসেছিল খুব। বলেছিল, "আরে, এটা আমেরিকা রিয়ান। রোবটের ফ্যাক্টরি নয়। আমরা সবাই মোটেই অমন শোকেসে সাজানো মানুষ নই। পারসেন্টেজ হয়তো অমন মানুষ একটু বেশি, কিন্তু আমরাও খুব কিছু কম নই। তুমি আসবে আমার বাড়ি। আরে, ধ্যাঙ্কসগিভিংটা তুমি তো হসপিটালেই কাটালে! আই ফেল্ট সো ব্যাড! জানো, আমার ছেলে তোমার চেয়ে জাস্ট দু'বছরের ছোট। ইউ মাস্ট কাম। ইউ উইল লাইক ইট। তুমি যদি বলো, আই উইল সেন্ড আ কার।"

আমি ওতা করতে বারণ করেছি। টমের বাড়ি এসএমইউ-এর কাছেই। ফলে এসএমইউ শাটল করে কলেজের কাছে নেমে হেঁটে চলে যাব। এটা কোনও ব্যাপার নয়!

আমি দেশে থাকলে এভাবে কারও নেমন্তন্নে যাওয়ার কথা ভাবতামই না! কিন্তু এই দেশে কেউ সামান্যতম নেমন্তন্ন করলেই আমি চলে যাই!

বিদেশে পড়তে আসার আগে আমি ভাবতে পারিনি এখানে জীবন এমন শক্ত হবে! এখানের সবচেয়ে বড় শত্রু হল একাকিত্ব! একেই হাতে টাকা-পয়সা থাকে না। তার উপর প্রায় গোটা সময়টাই কাজে ডুবে থাকতে হয়। আর বন্ধু বলতে তেমন কেউ নেই!

এই নেমন্তন্নগুলোতে গেলে তাও মানুষের সঙ্গে একটু কথাবার্তা হয়! নিজেকে একবেলা রান্না করতে হয় না। আর তেমন-তেমন জায়গায় গেলে তো উদ্বৃত্ত খাবার সঙ্গে করে নিয়ে আসাও যায়।

মাঝে-মাঝে রাতে প্যাটিওতে দাঁড়িয়ে সামনের অন্ধকার রাস্তাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে আমার খুব মন খারাপ করে! মনে হয়, এ কোথায় এসে পড়লাম। এখন আমি যদি মরেও যাই, মা তো সঙ্গে-সঙ্গে জানতেও পারবে না। আমায় দেখতে আসতেও পারবে না। চোদ্দো বছর বয়স থেকে সেই যে কলকাতা থেকে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটা চেপেছিল, সেটা বাস্তবে সম্পূর্ণ হওয়ার পর এমন হেরে যাওয়ার ফিলিং হয় কেন? কেন বারবার মনে হয় আমার চেয়ে কষ্টে আর কেউ নেই! কেন কখা খেতে বসে মাঝে-মাঝে জল চলে আসে চোখে! ঘুমের মধ্যে কেন আমি আচমকা রাজির হাতের স্পর্শ পাই! কী হয়েছে আমার! যাকে চিরকাল মুক্তি ভেবে এসেছি, সেটা এমন ছাঁপাস্তরের মতো লাগছে কেন? তবে নিজের চাহিলা ও লক্ষ্য সম্বন্ধে নিজেকে যে বুঝিয়ে এলাম এত বছর, সেটা কি ভুল ছিল? নিজেই কি নিজেকে বোকা বানালাম? কেন? কিসের থেকে পালাতে চাইছিলাম আমি?

'হাই!' আচমকা পিছন থেকে একটা হাত এসে আমার কাঁধে টোকা দিল। আমি অবাক হলাম। কে ডাকছে আমায়। আমার বাঁ হাতে ব্যান্ডেজ করা রয়েছে। তাই চট করে ঘুরতে পারলাম না। সময় নিয়ে ধীরে-সুস্থে আমি পিছনে ঘুরলাম।

একটা মেয়ে। সামান্য মোটা। লালচে কোঁকড়া চুল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমি অবাক হলাম। মেয়েটা কে? আমায় ডাকছে কেন? আমি তো চিনি না!

"ইয়েস?" আমিও সামান্য হাসলাম।

বাসটা বেশ ফাঁকা। পিছনের দিকে আমি আর এই মেয়েটা ছাড়া কেউ নেই।

মেয়েটা নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "লুসি। ওয়ান্না হ্যাভ সাম কাপকেক?"

আমি দেখলাম মেয়েটার হাতে একটা বড় চৌকো প্যাকেট। তার ঢাকনা খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল প্যাকেটটা। প্রায় ডজন খানেক কাপকেক! আমাদের দেশে আমরা কাপকেক দেখেছি। খেয়েছিও। কিন্তু এদেশে এসে দেখছি কাপকেক দেখলে এরা কেমন যেন করে! মানে, অদ্ভুত একটা ভালবাসা আছে এদের এই কেকটির ব্যাপারে। কেন, তা জানি না।

সে থাকুক। যার যা ভাল লাগে। কিন্তু আমার ভাল লাগে না।

আমি হাসলাম। মাথা নেড়ে না বলে বললাম, "থ্যাঙ্কস।"

"দে আর নাইস," লুসি হাসল, "তুমি নিতেই পার।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। কোনও কেক জাতীয় জিনিস আমি খেতে পারি না। ডিমে অ্যালার্জি আছে আমার। বললাম, "না, না, আমার ডিমে অ্যালার্জি আছে। বাট থ্যাঙ্কস এনি ওয়ে।"

লুসি প্যাকেটটা বন্ধ করে বলল, "সো সরি টু হিয়ার দ্যাট। আমাদের অ্যামেরিকান ওয়ের একটা পার্ট হল কাপকেক। বাই দ্য ওয়ে, আর ইউ অ্যালোন?"

আমি হাসলাম, "হ্যাঁ।"

লুসি অবাক হল, "আজ তো ইউনিভার্সিটি বন্ধ! তা হলে তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"নেমন্তন্ন আছে," আমার এমন করে পিছন ফিরে কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে খুব।

"তোমার বোধ হয় অসুবিধে হচ্ছে!" লুসি উঠে দাঁড়িয়ে আমার পাশের সিটে এসে বসতে গেল। কিন্তু পারল না।

"সরি, দিস সিত ইজ টেকেন।"

গলাটা শুনে অবাক হয়ে দেখলাম, ইয়ানা! বাসটা আর-একটা স্টপে থেমেছে আর সেখান থেকে ইয়ানা উঠেছে!

ইয়ানা লুসির উত্তরের অপেক্ষা না করে ধপ করে বসে পড়ল আমার পাশে। লুসি স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট হল। কিন্তু কিছু বলল না। বরং উঠে গিয়ে এবার কিছুটা সামনের দিকের একটা সিটে বসল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম, "তুমি!"

ইয়ানা হাসল। তারপর ব্যাগ থেকে একটা টফি বের করে এগিয়ে দিল আমায়।

আমি টফিটা নিয়ে বললাম, "তোমার গাড়ি কই?"

ইয়ানা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "গ্যারাজে। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একটু।"

আমি মাথা নাড়লাম। ইয়ানার ডাফল ব্যাগের পাশ দিয়ে চারটে র‍্যাকেট উঁকি মারছে। বুঝলাম প্র্যাকটিসে যাচ্ছে।

বললাম, "সরি ইয়ানা, তোমার অনেকগুলো ক্লাস মিস গেছে। আমি ঠিক করিয়ে দেব। কাল সানডে আছে। তোমার টাইম থাকলে আমরা পড়তে বসতে পারি।"

ইয়ানা যেন শুনল না আমার কথাটা। বরং চট করে একবার সামনের দিকে দেখে নিয়ে বলল, "লুসির সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল?"

আমি সামান্য অবাক হলাম, "তেমন কিছু নয়। ও কাপকেক দিতে চাইছিল। আমি বলছিলাম যে আমার থাওয়া বারণ।"

ইয়ানা বলল, "তুমি একা কি না জানতে চাইছিল?"

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। ও কী করে জানল!

ইয়ানা আমার মুখের ভাব দেখে হাসল। বলল, "শি ইজ ওয়ান মান-ইগার!"

"আ!" আমি ঘাবড়ে গেলাম।

"আরে, উইকেন্ডে ও এমন করে ছেলেদের পাঁয়ায়," ইয়ানা হাসল, "তারপর নিজের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়ে শোয়।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

ইয়ানা বলল, "আজ তোমার দিন ছিল। তত্তুল করে দিলাম বলে রাগ করলে নাকি?"

আমি হেসে মাথা নাড়লাম, "কী বলছ!"

ইয়ানা লুসির দিকে আমায় ইশারা করে হাসল। দেখলাম, সামনের দিকে অ্যাফ্রিকান-অ্যামেরিকান একটা ছেলের সঙ্গে গল্প শুরু করেছে মেয়েটা।

ইয়ানা চাপা গলায় বলল, "শি হ্যাজ গত হার উইক-এন্ড।"

আমি এখানে এসে যত এদের দেখি অবাক হয়ে যাই। প্রেম ব্যাপারটা নিয়ে এদের খুব অদ্ভুত একটা ধিধা আছে। সহজে কেউ কাউকে প্রেমের কথা জানাতে চায় না। কিন্তু শোওয়া ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। শ্বাসপ্রশ্বাসের মতোই জরুরি। এখানে ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড নিয়ে কেউ বিশাল মাথা ঘামায় না। আমি ছোটবেলা থেকেই এসব নিয়ে চিন্তিত নই। তা হলেও এসব দেখে প্রথমে যে একবার কালচারাল শক হয়নি তা নয়, কিন্তু এখন আর হয় না। বিশেষ করে নানিয়ার সঙ্গে ব্যাপারটা হয়ে যাওয়ার পর!

আচমকা আমার নানিয়ার কথা মনে পড়ে গেল! সেই ঘটনার পর থেকে মেয়েটা আমায় এড়িয়ে চলছে। আমিও, সত্যি বলতে কী, ওর সঙ্গে কথা বলার উদ্যোগ দেখাচ্ছি না। এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যে দু'জনের কাছেই ব্যাপারটা খুব অস্বস্তির!

আমায় শরথ মাঝে-মাঝে জিজ্ঞেস করে, "নানিয়া আর আসে না কেন রে?"

আমি চুপ করে থাকি।

শরথ তাও ছাড়ে না। ওর প্রশ্ন করার বাতিক বজায় রেখে বলে, "ঝামেলা হয়েছে তোদের মধ্যে? কী রে প্রোপোঞ্জ-ফোপোঞ্জ করতে গিয়েছিলি নাকি? তোদের বাঙালি ছেলেদের শালা সর্দির মতো প্রেম হয়! কী রে, প্রোপোঞ্জালে নানিয়া রেগে গিয়ে তোর সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছে?"

আমি আর পারিনি। বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, "আর কত ভাট বকবি? এবার একটু থাম!"

শরথ হেসে বলেছিল, "আরে রাগ করছিস কেন? তুই যখন সিনে নেই, আমি তখন ট্রাই করব একবার? আমার ওকে দেখলেই খুব টিংলিং ফিলিং হয়! প্রথমে আমি ভাবছিলাম হয়তো হজম হচ্ছে না! প্যাস! কিন্তু এখন বুঝতে পারছি অন্য কেস! আচ্ছা প্রেম আর পেটের প্রবলেম কি একই রকম ফিলিং দেয়?"

AMARBOI.COM

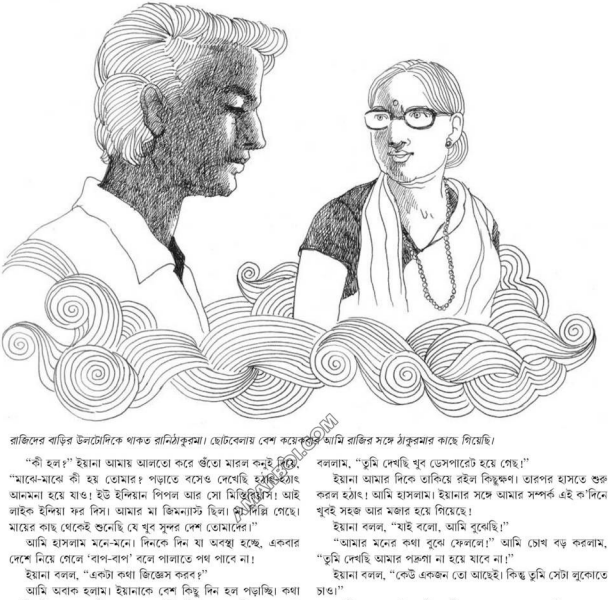

রাজিদের বাড়ির উলটোদিকে থাকত রানিঠাকুরমা। ছোটবেলায় বেশ কয়েকবার আমি রাজির সঙ্গে ঠাকুরমার কাছে গিয়েছি।

"কী হল?" ইয়ানা আমায় আলতো করে গুঁতো মারল কনুই দিয়ে, "মাঝে-মাঝে কী হয় তোমার? পড়াতে বসেও দেখেছি হঠাৎ-হঠাৎ আনমনা হয়ে যাও! ইউ ইন্দিয়ান পিপল আর সো মিস্টিরিয়াস! আই লাইক ইন্দিয়া ফর দিস। আমার মা জিমন্যাস্ট ছিল। মাস্টারিল্লি গেছে। মায়ের কাছ থেকেই শুনেছি যে খুব সুন্দর দেশ তোমাদের।"

আমি হাসলাম মনে-মনে। দিনকে দিন যা অবস্থা হচ্ছে, একবার দেশে নিয়ে গেলে 'বাপ-বাপ' বলে পালাতে পথ পাবে না!

ইয়ানা বলল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

আমি অবাক হলাম। ইয়ানাকে বেশ কিছু দিন হল পড়াচ্ছি। কথা বলছি। কিন্তু কোনও দিন এমন গলায় কিছু জিজ্ঞেস করেনি! স্বর শুনেই বুঝতে পারছি যে ও ব্যক্তিগত কিছু জিজ্ঞেস করবে।

ইয়ানা আবারও বলল, "ইফ ইত ইজ ওকে উইথ ইউ।"

আমি মাথা নাড়লাম।

"দু ইউ হ্যাভ এনি পক্সগা?"

"কী!" আমি বুঝতে পারলাম না।

"আই মিন, গার্লফ্রেন্ড?" ইয়ানা হাসল।

"কোন সেঙ্গে?" আমি পালটা জিজ্ঞেস করলাম।

"লাইক বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড সেঙ্গে!" ইয়ানা তাকাল আমার দিকে।

আমি ওর ওই অদ্ভুত নীল চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "এভাবে তাকালে হয়ে যাবে!"

"খুব! না!" ইয়ানা হেসে ফেলল। তারপর বলল, "এত লোনলি টাইপ ছেলেদের কোনও মেয়ে পছন্দ করবে না! কী এত কষ্ট তোমার! সবসময় এমন পেনসিভ মুখে থাকো কেন?"

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, "তুমি আমার পক্সগা হওয়ার চেষ্টা করছ নাকি!"

ইয়ানা ঘাবড়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর আলতো করে আমায় একটা চাঁটি মেরে বলল, "খালি ইয়ার্কি!"

"এ তো ফিক্সিক্যাল কনট্যাক্ট!" আমি বিস্মিত হওয়ার ভান করে বললাম, "তুমি দেখছি খুব ডেসপারেট হয়ে গেছ!"

ইয়ানা আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হাসতে শুরু করল হঠাৎ! আমি হাসলাম। ইয়ানার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এই ক'দিনে খুবই সহজ আর মজার হয়ে গিয়েছে!

ইয়ানা বলল, "যাই বলো, আমি বুঝেছি!"

"আমার মনের কথা বুঝে ফেললে!" আমি চোখ বড় করলাম, "তুমি দেখছি আমার পক্সগা না হয়ে যাবে না!"

ইয়ানা বলল, "কেউ একজন তো আছেই। কিন্তু তুমি সেটা লুকোতে চাও!"

আমি বললাম, "সব কিছু যদি এত সহজ হয়ে যেত ইয়ানা, তবে তো আর ঝামেলাই থাকত না জীবনে! আর আমার কোনও ইন্টারেস্টিং স্টোরি নেই!"

ইয়ানা হয়তো আরও কিছু বলত। কিন্তু বাস এসে পড়েছে ইউনিভার্সিটির সামনে। আমরা উঠে পড়লাম।

বাস থেকে নেমে ইয়ানা তাকাল আমার দিকে। বলল, "আমি কাল আসছি তোমার বাড়ি। আর রিয়ান, যতই তুমি ঢাকার চেষ্টা করো, ইউ দু হ্যাভ আ স্তোরি!"

আমি আবার গম্ভীর হয়ে বললাম, "সত্যি তুমি পক্সগা না হয়ে ছাড়বে না!"

এখান থেকে টমের বাড়িটা হেঁটে বেশি দূর নয়। মাইল খানেক। প্রথম-প্রথম ছোট ল্যাংগের সঙ্গে-সঙ্গে এইসব 'ইউনিট' নিয়েও মুশকিল হত। আমরা দূরত্ব বোঝাতে কিলোমিটার বলি, ওরা মাইল দিয়ে বলে। আমরা কিলোগ্রামে ওজন মাপি, ওরা পাউন্ড বলে। আমরা সেলসিয়াস বলি, ওরা ফারেনহাইটে উষ্ণতা-শীতলতা মাপে। তবে এখন আর অসুবিধে হয় না।

আমি হাঁটতে শুরু করলাম। এই প্রথম টমের বাড়ি যাচ্ছি। খালি হাতে তো আর যাওয়া যায় না! তাই একটা ওয়াইনের বোতল কিনেছি। আমার বাঁ হাতে এখনও ব্যান্ডেজ করা। টান বা চাপ পড়লে ব্যথা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সাইড ব্যাগটাকে বাঁ কাঁধ থেকে ডান কাঁধে নিলাম। সত্যি, কী যে ভোগান্তি! কোথা থেকে কিছু নেই, হঠাৎ কী যে হয়ে গেল!

সেই রাতে আমার শরীরটা ভাল ছিল না। একটু জ্বর-জ্বর লাগছিল। ভাতও খেতে পারিনি। সামান্য একটু নুডলস সেদ্ধ করে খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। মোটা একটা কম্বল গায়ে চাপিয়েছিলাম। আর বুঝতে পারিনি আমার কোথা থেকে সেনসেটিভ ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে!

মাকড়সাটার নাম 'ব্রাউন রেক্লুজ'। টেক্সাস শুকনো জায়গা। পুরনো দিনে নাকি নানা বিষাক্ত প্রাণী ও পোকামাকড় পাওয়া যেত এখানে। এখনও বোধ হয় কিছু রয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে একটা হল এই মাকড়সাটা। বাদামি, নিরীহ দেখতে। কিন্তু তার পেটে-পেটে যে এত বুঝব কী করে!

ভোর রাতের দিকে কেমন একটা জ্বালা নিয়ে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলাম। ক্রত আলো জ্বালিয়ে দেখেছিলাম, বাঁ হাতের কনুইয়ের নিচে একটা ছোট গর্ত মতো হয়েছে। ব্যাপারটা কী! আমি বিছানা থেকে নেমে কম্বলটা ঝেড়েছিলাম মাটিতে। আর দেখেছিলাম একটা মাকড়সা। ছোট। পাতলা। বাদামি রঙের। আমি বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা কী হল! তবে মাকড়সাটাকে সঙ্গে-সঙ্গে মেরে ফেলেছিলাম জুতো দিয়ে। তারপর স্কচ্ছ অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম লাগিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।

সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ ঘুম ভাঙে প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে। সঙ্গে গায়ে ব্যথা। আমি বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছে।

কোনওমতে বিছানা থেকে উঠে উলতে-উলতে আমি গিয়েছিলাম শরথের দরজায়। ধাক্কা দিয়ে জানিয়েছিলাম ওকে।

ঘুম চোখে আমায় দেখে প্রথমে কিছুটা বিরক্ত হলেও আমার মুখটা ভাল করে দেখে ও থমকে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, "তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?"

আমি বলেছিলাম, "জ্বর খুব। গায়ে ব্যথা। একটা মাকড়সা কামড়েছিল শেষ রাতে। তারপর..."

আমায় আর কথা শেষ করতে দেয়নি শরথ। সঙ্গে-সঙ্গে বলেছিল, "আরে কী বলছিস! কেমন দেখতে মাকড়সাটা? পাতলা, বাদামি রঙের?" আমি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলেছিলাম।

"সর্বনাশ," শরথের অবশিষ্ট ঘুমটাও চলে গিয়েছিল, "আরে, ওটা ব্রাউন রেক্লুজ! খুব বাজে মাকড়সা। চল হসপিটালে। আমি তোর সামুদাকে ফোন করছি!"

"হসপিটাল!" আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

"শালা এক আটলান্টিক কেস খাবি! খুব ফালতু মাকড়সা। আমাদের কলকাতার ম্যানাসা জিনিস নয়। চল!"

শরথ ক্রত সামুদাকে ফোন করে একটা ট্যাক্সি ডেকেছিল। হসপিটাল পৌঁছতে-পৌঁছতে আমার জ্বর বেড়ে গিয়েছিল আরও। প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তাই স্পষ্ট মনে নেই কিছু। শুধু বুঝেছিলাম আমার অপারেশন হয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছে। গায়ে খুব ব্যথা!

সামুদা এসেছিল। সামুদা বাড়িতেও নাকি ফোন করে দিয়েছিল। পরের দিন মায়ের সঙ্গে ফোনে কথাও বলিয়ে দিয়েছিল সামুদা। মা খুব কান্নাকাটি করেছিল ফোনে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল সব। শেষে বলেছিল, "রাজিকে একটা খবর দিস, কেমন?"

প্রায় আঠারো দিন হয়ে গিয়েছে সেই ঘটনার, কিন্তু আজও বাঁ হাতে অস্বস্তি আছে। শুনেছি এই মাকড়সার বিষ থেকে নাকি সুদূরপ্রসারী নানা রোগ হয়। তাই এখনও আমায় ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। ক্লেসিং করাতে হয়।

সবই করাচ্ছি নিয়মমতো। কিন্তু রাজিকে আর খবর দেওয়া হয়নি! আমার কেমন লাগে ওকে কিছু লিখতে। কথা বলতে। যে-মেয়েটাকে আমি রোজ দেখতাম, রোজ কথা বলতাম, সেই মেয়েটা গত তিন মাস পুরো 'নেই' হয়ে গিয়েছে আমার জীবন থেকে! কিন্তু সত্যি কি গিয়েছে!

রাতে, আমার শোওয়ার ঘরের জানালা দিয়ে মাঝে-মাঝে বাইরের দিকে তাকাই আমি। সাইড ওয়াকের পাশে একটা বড় গাছ আছে। আবো অন্ধকারে মনে হয় কে যেন বসে রয়েছে ওখানে। যেন আমার জানালার দিকে তাকিয়ে রয়েছে নির্নিমেষ! যেন ওখানে বসে, আমার দিকে তাকিয়ে তার দিন কাটছে, রাত কাটছে। তার গ্রীষ্ম আর শীত কাটছে! ছোটবেলায় ঠাকুরমার থেকে শোনা এক রূপকথার গল্প মনে পড়ে যায় আমার! আমি আলতো করে আমার জানলায় ব্লাইন্ড নামিয়ে দিই। আমার বুকের ভিতর কেমন একটা কষ্ট হয়। রাজির মুখটা মনে পড়ে! টিকালো নাক আর বড়-বড় চোখ মনে পড়ে! হঠাৎ শীত করে ওঠে খুব। মনে হয় আসলে আমিই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রু! কিন্তু তারপরই বাবার মুখটা মনে পড়ে যায়! মনে পড়ে মায়ের সেই এগারো বছর আগের চোখদুটো! ভালবেসেই একসঙ্গে ছিল না তারা? যা যে এখনও সেই শূন্য অন্ধকার খনি খুঁড়েই সোনা খুঁজে যাচ্ছে! আমি তো মাকে বলতে পারছি না যে, "বাবা কোনও দিন ভালবাসেনি তোমায়!" আমি জানি কলকাতায় থাকলে মা কোনওদিন ভাল থাকবে না। তাই মাকে আমায় এখানে নিয়ে আসতে হবে। প্রেম তার সর্বস্ব লোভানি দিয়ে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করলেও আমি ভুলব না। রাজি আমার জীবনে ওই অন্ধকার গাছের এমটুকুই হয়ে থাকুক!

টমের বাড়ি দেখে আমি চমকে গেলাম! আমি জীবনে এমন বাড়ি শুধু হলিউডের ফিল্মেই দেখেছি! গেট, বাগান আর সুইমিং পুল পেরিয়ে বিশাল বাড়ি! যার একটা দিক পুরো কাচের! আমি মূল বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কেমন যেন ভ্যাবলা মেরে গেলাম! আমার ব্যাগের ভিতর রাখা সস্তার ওয়াইনের বোতলটা যেন নিজের থেকেই কুঁকড়ে হোমিওপ্যাথির শিশি হয়ে গেল!

টম আমায় নিজে এসে নিয়ে গেল ভিতরে। ভিতরটা দেখে আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম! এটা কোথায় এলাম রে বাবা! এত দামি-দামি পেন্টিং! এমন উড প্যানেল করা ঘর! মাথার উপর ঝাড়বাতি! বসার ঘরেই তিন সেট সোফা! আমি ভাবলাম এমন বাড়িতে থাকতে টমের কমপ্লেক্স হয় না!

দেখলাম ঘরের ভিতর আরও তিন-চারজন রয়েছে। টম তাদের দিকে তাকিয়ে আমায় দেখিয়ে বলল, "মিট আওয়ার নিউ পিটার পার্কার! কার্টেসি, ব্রাউন রেক্লুজ!"

আমি কিছু বলার আগেই দেখলাম সবাই হেসে উঠল টমের কথায়।

টম বলল, "মেক ইয়োরসেল্ফ কমফর্টেবল। আমি একটু আসছি!"

টম ঘরের অন্য দিকে চলে গেল। এখন কী করা উচিত আমার! ওই হোমিওপ্যাথির শিশিটা বের করব? নাকি চুপচাপ ঘরে নিয়ে গিয়ে শরথের কাছে সমর্পণ করব! এখানে যা দেখছি দেওয়ালে ওই কোণের ছবিটা অরিজিনাল ক্লদ মনে হলে আশ্চর্য হব না! সেখানে এই ওয়াইন!

আমি কী করব ভাবছি এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে একটা হাত এসে আলতো করে সোনা দিল আমার কাঁধে।

আমি পিছনে ঘুরলাম। আর ঘুরেই মনে-মনে আরও কিছুটা কনবনিয়ে গেলাম! এ এখানে কী করছে? টম একেও বলেছে? আমায় তো জানায়নি কিছু! জানলে আমি আসতাম না। কারণ আমার এই যথেষ্ট জটিল জীবনে আমি আর নতুন করে নানিয়া ধীলোঁ নামক কোনও জটিলতা আনতে চাই না।

এগারো

রাজিতা

শাড়ি খুব ঝামেলার জিনিস! আমি ঠিক সামলাতেই পারি না। খালি মনে হয় এই বুঝি পায়ে জড়িয়ে, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাব! আমার এত দৈনন্দিন হয় শাড়ি পরলে! কিন্তু কিছু করারও নেই। শাড়ি আজ পরতেই হয়েছে!

আমি ভেবেছিলাম যেমন কুর্তি লেগিংস পরি, তেমনই পরে যাব। কিন্তু জেঠিমা থাকতে আর আমার মর্জি কবে চলেছে!

AMARBOI.COM

স্নান করে আমি রোজকারের মতো কুর্তি পরে তৈরি হয়ে নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বেরিয়ে যাব এবার। কিন্তু ঠিক তখনই জুডো এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে।

আজ রবিবার। জুডো তো সকাল দশটায় ঘুম থেকে ওঠে না। তবে?

জুডো আমার মনের ভাব আন্দাজ করে বলেছিল, "মা আজ তুলে দিয়েছে ঘুম থেকে। বলে, 'তোর দিদির জীবনে এত ইম্পরট্যান্ট দিন! আর সেখানে তুই পড়ে-পড়ে ঘুমোবি?' "

আমি চোয়াল শক্ত করে নিজেকে সামলেছিলাম। সারা বাড়িতে এমন হ্যালোমো শুরু হয়েছে যে কী বলব! সুজাতাদিকে একবার একা পাই, এমন বলব না!

আমি জুডোর পিছন-পিছন দোতলায় নেমে এসেছিলাম।

বাবা শুয়েছিল বিছানায়। আমায় দেখে সামান্য হাসি ফুটেছিল মুখে। সুস্থ হাতটা তুলে বসতে বলেছিল পাশে। আমি সেখানে বসতে-বসতে দেখেছিলাম ঘরের অন্য পাশে জেঠিমা আর মা বসে রয়েছে।

আমি ঠোঁট টিপে তাকিয়েছিলাম জেঠিমার দিকে। মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম কোনও ব্যাপার আছে নিশ্চয়ই।

"বলো," আমি ব্যাগটাকে কোলের উপর গুছিয়ে তাকিয়েছিলাম সামনে।

জেঠিমার হাতে চায়ের কাপ ছিল। সেটা ছোট্ট টেবিলে রেখে জেঠিমা ভাল করে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তারপর বলেছিল, "আমি জানতাম তুই এটাই করবি। তাই মিঠিকে বলেছিলাম, আমায় যেন ডাকে একবার।"

আমি ঘতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। আমি কী করলাম আবার! জেঠিমা এমন করে বলছে কেন?

জেঠিমা মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "দেখ, তোর মেয়ের অবস্থা দেখ! বুঝতে পারছে না কী করেছে! কী মেয়ে মানুষ করেছিস তোরা?"

বাবা জড়ানো গলায় বলেছিল, "বউদি, এসব থাক না।"

"তুমি চুপ করো," জেঠিমা বাবাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "বোধ হয় কাণ্ডজ্ঞান নেই? এমন ড্রেস পরে কেউ ওসব জায়গায় যায়?"

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, "এমন ড্রেস পরে ওসব জায়গা মানে!"

"মানে এমন কুর্তি লেগিংস পরে কেউ নিজের হবু শ্বশুরবাড়ি যায়?"

"জেঠিমা!" আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, "কার শ্বশুরবাড়ি! কীসব বলছ!"

এবার মা ধমক দিয়েছিল আমায়, "এমন করে চেঁচাচ্ছিস কেন? বড়দের সামনে এমন অসভ্যতা করতে হয়?"

আমি চুপ করে গিয়েছিলাম সঙ্গে-সঙ্গে। আমি অপমানসূচক কিছুই বলিনি। কিন্তু আজকাল মা কেমন যেন হয়ে গিয়েছে! আসলে বাবার মিল বন্ধ হওয়ার পর থেকে আমাদের সংসারে জেঠু টাকা দিচ্ছে। আমার যা আয় আর বাবার করে রাখা পোস্ট অফিসের এমআইএস থেকে পাওয়া টাকার বেশিটাই চিকিৎসার পিছনে খরচ হয়ে যাচ্ছে। তাই জেঠুর দেওয়া টাকার উপর আমাদের অনেকটা নির্ভর করতে হয়।

আর এই কারণেই মা যেন একটু বেশি ভয় পায় জেঠু যদি রেগে যায় তবে হয়তো টাকা-পয়সা আসা বন্ধ হয়ে যাবে। না, মা এভাবে খোলাখুলি কিছু বলে না। কিন্তু আমি তো জানি মাকে!

জেঠিমা বলেছিল, "কীসব বলছি মাকে! অমন ছেলে আর পাবি? সুজাতাকে ধন্যবাদ দে!"

আমি বাবার দিকে তাকিয়েছিলাম। বাবা আলতো করে হাত রেখেছিল আমার পিঠে। জড়ানো গলায় বলেছিল, "তোকে কেউ জোর করছে না মা। তোর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিচ্ছু হবে না।"

বাবার দিকে তাকিয়ে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। এই মানুষটা যদি সুস্থ থাকত, তা হলে আজ আমায় এমন কিছু করতে হত!

আকাশ যে সত্যি এতটা ভেবে ফেলেছে সেটা আমি বুঝতে পারিনি। আজ ওর বাড়িতেই আমার দেখা! আকাশের বাবা নিজে ফোন করেছিলেন আমাদের বাড়িতে। তবে তার আগে সুজাতাদি মাকে আর জেঠিমাকে বলে রেখেছিল।

আমি তো যেতেই চাইনি! কেন চাইব? জানি না, চিনি না, নেমন্তন্ন বললেই হল? কিন্তু মা, জেঠিমাকে কে বোঝাবে?

সুজাতাদি নাকি এও বলেছে যে, আকাশের মায়ের তো খুব শরীর খারাপ, তাই আসতে পারবেন না আমাদের বাড়ি। সেজন্যই আমায় দেখতে চেয়েছেন!

মা প্রথমে একটু খুঁতখুঁত করছিল। বলেছিল, "ডিভোর্সি পাত্র! দোজবরে! আমার মেয়েকে দেব?"

জেঠিমা কিন্তু সেসব পাত্তাই দেয়নি! মাকে ধামিয়ে দিয়ে বলেছিল, "তুই কি পাগল নাকি? আজকালকার দিনে কেউ ওসব ভাবে? ওত ভাল ছেলে! কোন বিদেশি মেয়ে ওর মাথা চিবিয়েছিল ঠিক আছে! এখন আমাদের মেয়েকে পছন্দ হয়েছে! আর সেদিন তো ছেলেকেও দেখলাম! কী সুন্দর দেখতে! তবে? না, না, তুই সুজাতাকে বল, রাজি যাবে ওদের নেমন্তন্নে!"

আমার জীবন নিয়ে কথা হচ্ছে, কিন্তু তাতে আমার কোনও কথা বলার অধিকার নেই যেন! আমি পিংপং ম্যাচ দেখার মতো একবার মা আর একবার জেঠিমাকে দেখছিলাম!

আজ সেই নেমন্তন্ন আমার! নেমন্তন্ন, নাকি মেয়ে দেখা? আমার মুখটা সকাল থেকেই তেতো হয়েছিল। আর সেটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল জেঠিমা!

জেঠিমা চায়ের কাপটা তুলে চুমুক দিয়ে বলেছিল, "নিচে চল। তোর জন্য শাড়ি কিনে রেখেছি! পরে যাবি। এমন পেতনি হয়ে যাবি না।"

বাবা আলতো করে হাত রেখেছিল আমার পিঠে। নরম গলায় বলেছিল, "ইচ্ছে না হলে যেতে হবে না মা।"

"না! হবে," মা এবার ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, "আর লাই দিও না! আজ যদি ভাল করে পড়াশোনা করত, অন্তত মাস্টার ডিগ্রিটা করতে পারত, তা হলেও ভাবনা ছিল না। সেটাও পারল না। চাকরি কি গাছে ফলে? ওই তো এত জায়গায় চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে হল কিছু? সেদিন তো ঘটা করে একটা স্কুলেও ইন্টারভিউ দিয়ে এল, তবে? রিয়ানের মামার সোর্স! কিছু হল? ওকে বিয়ে দিয়ে দেব। ব্যস!"

আমি আর একটাও কথা না বলে জেঠিমার সঙ্গে নিচে চলে গিয়েছিলাম। মনের ভিতরটা রাগে অসাড় হয়ে গিয়েছিল! মা এমনটা বলতে পারল? আমি কি চেষ্টা করছি না? বিয়ে দিয়ে আমায় বিদায় করতে চাইছে?

আমি দেখেছি কষ্টগুলো চুম্বকের মতো। একটা ব্যাপারে শুরু হয়, তারপর আরও নানা রকম কষ্টকে টেনে-টেনে আনে! যেমন মায়ের অমন কথার থেকে শুরু হওয়া কষ্টটা টেনে এনেছিল রিয়ানের জন্য কষ্ট! মনে হয়েছিল আমায় যখন কেউ চায় না, তখন আমি একাই ভাল।

জেঠিমা রাগী বটে, কিন্তু ভালবাসে খুব আমায়। নিজের হাতে যত্ন করে শাড়ি পরিয়ে দিয়েছিল আমায়। সামান্য সাজিয়েও দিয়েছিল। আমি কিচ্ছু প্রতিবাদ করিনি। চোয়াল শক্ত করে বসেছিলাম শুধু।

সব কিছুর পরে জেঠিমা আমায় আয়নার সামনে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, "এমন রূপকে ঢেকে রাখিস কেন? কার উপর রাগ করে? ওই জানোয়ারটার উপর?"

আমার আবার জল চলে এসেছিল চোখে! আর আটকাতে পারিনি। ছোট-ছোট দানায় জলের পুঁতি গড়িয়ে পড়েছিল গাল হয়ে শাড়ির আঁচলের উপর।

জেঠিমা আমার থুতনিটা ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছিল, "কার জন্য কাঁদছিস রাজি? ওই জানোয়ারটার জন্য! তিন মাসের বেশি হয়ে গেছে। ও একবারও ফোন করেছে তোকে? একটা ইমেল করেছে? ভুলে গেছে সারা জীবন ধরে তুই কী-কী করেছিস ওর জন্য! সবাই জানে তুই ওকে কত ভালবাসিস! কিন্তু ও জানে না? ন্যাকা! হাড় শয়তান!

AMARBOI.COM

আর কোনও দিন এ বাড়িতে আসুক। আমি যদি না ওকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছি, তবে আমার নাম পাল্টে দিবি! যে তোমার ভালবাসবে, জানবি সে তোকে কষ্ট দেবে না! যে কষ্ট দেবে, সে তোকে ভালইবাসেনি জানবি!"

আমি চোখটা মুছে স্বাভাবিক হয়েছিলাম। অন্য এক পুরুষের জন্য নিজেকে সাজালাম? অন্য এক পুরুষের জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করছি? রিয়ান আমায় এত দূরে পাঠিয়ে দিল? কেন? ওই ঘটনাটার জন্য? ও কি জানত না ব্যাপারটা? আমি বললাম বলেই দোষ হয়ে গেল! আমায় এমন করে ছুড়ে ফেলে দিল জীবন থেকে?

জেঠিমা বলেছিল, "আজ যাওয়ার আগে একবার ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করে যাস। প্রণাম করে যাস। কেমন?"

আমি বলেছিলাম, "আচ্ছাশকে আমার যদি পছন্দ না হয়?"

জেঠিমা হেসে বলেছিল, "তোদের এই বয়সের সমস্যা কী জানিস? সব কিছুকেই তোরা ইচ্ছে দিয়ে মাপিস! আজ এটা ইচ্ছে, কাল ওটা ইচ্ছে! শোন, জীবনকে দায়িত্ব দিয়ে মাপ, দেখবি মনের ভাললাগা আর আনন্দ অনেক বেশি পাবি।"

অনেক দিন ঠাকুমার কাছে যাইনি। আগে তো রোজ যেতাম। কত গল্প বলত ঠাকুরমা। আজকাল কেমন যেন চুপ হয়ে গিয়েছে মানুষটা। আমার বারান্দা থেকে দেখি একা-একা বসে রয়েছে। আমার দিকে খুব একটা তাকায়ও না! দূরের দিকে তাকিয়ে কীসব যেন ভাবে!

ঠাকুরমাদের বাড়ির সবাই আমায় চেনে। ভালওবাসে। কিন্তু এখন আর অতটা ঘনিষ্ঠতা নেই। আজ আমায় এমন সাজগোজ করা দেখে তাই সবাই একটু অবাক হলেও বিশেষ প্রশ্ন করেনি।

কুকি বলে একটা মেয়ে ঠাকুরমার কাজ করে। আমি তিনতলায় সোজা উঠে গিয়েছিলাম। কুকি ঘরের সামনের বারান্দায় ঝাঁট দিচ্ছিল। আমায় দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল একদম। বলেছিল, "রাজিদিদি, তুমি! ভুল করে এলে?"

আমি লজ্জা পেয়ে বলেছিলাম, "না, আসলে নানা ঝামেলায় থাকি তো! তাই আসা হয় না। ঠাকুরমা আছে?"

কুকি হেসে বলেছিল, "আছে, কিন্তু ব্যস্ত!"

"এই সকালে?" আমি অবাক হয়েছিলাম।

কুকি ভুরু নাচিয়ে বলেছিল, "আজ আবার গল্পের আসর বসেছে!"

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম খুব, "আজ আবার আসর বসেছে! এত বছর পরে!"

কুকি বলেছিল, "হ্যাঁ, আমাদের নিচের তলায় ভাড়াটে এসেছে নতুন। তাদের তিনটে বাচ্চা। টুলু, জিকি আর টটি! ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ে। তারাই আজকাল এসে গল্প শুনতে চায়।"

আমি আলতো পায়ে ঘরের ভিতর ঢুকেছিলাম। আর সঙ্গে-সঙ্গে পেয়েছিলাম সেই গন্ধ! কর্পূর আর জর্দার! আচমকাই ছোটবেলাটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মনে। যেন দেখতে পেয়েছিলাম সামনের বড় খাটটায় বসে রয়েছে আগেকার রাজিতা আর রিয়ান!

খাটে বসেছিল ঠাকুরমা। সামনে তিনজন বাচ্চা! দু'জন মেয়ে আর একজন ছেলে। আমি ঘরে ঢুকতেই সবাই ফিরে তাকিয়েছিল। ঠাকুরমাও গল্প থামিয়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে। মুখ দেখেই বুঝেছিলাম খুশি হয়েছে!

আমি ভাল করে ঘরটাকে দেখছিলাম। বহুদিন রং হয়নি! দেওয়ালের জায়গায়-জায়গায় ড্যাম্প! ঝুল। খাটের পাশের টেবিলে ওষুধের স্তূপ। আমার খুব খারাপ লাগছিল! সত্যি এতটাই ব্যস্ত হয়ে গিয়েছি আমি যে মাস তিনেক আসতে পারিনি!

ঠাকুরমা শান্ত গলায় বলেছিল, "আয়, বোস। জানতাম, তুই আসবি। তোর জেঠি ফোন করে বলেছিল আমায়!"

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। জেঠিমার সঙ্গে তা হলে যোগাযোগ আছে ঠাকুরমার!

আমি গিয়ে বসেছিলাম খাটের কোনায়। তারপর বলেছিলাম, "তোমায় রোজ দেখি বারান্দায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে থাকো। কিন্তু আমার দিকে তাকাও না একবারও। কেন?"

"তুই ডাকিস না কেন?" ঠাকুরমা হেসেছিল।

আমি বলেছিলাম, "কেন ডাকব? যে আমার দিকে তাকায় না, আমি মোটেও নিজের থেকে তাকে ডাকি না!"

ঠাকুরমা সময় নিয়েছিল একটু। তারপর থেমে-থেমে বলেছিল, "বুড়ি হয়ে গেছি রাজি! চোখের অবস্থা খুব খারাপ! দশ হাত দূরের জিনিসও দেখতে পাই না। তোকে কী করে দেখব বল?"

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তা হলে আমি ঘরে এলাম, বুঝলে কী করে?"

ঠাকুরমা বলেছিল, "তোর গন্ধে! আমি তোর গন্ধ পাই! চন্দনকাঠের গন্ধ!"

আমার ভিতরটা কেমন যেন করছিল। খালি চোখে জল আসছিল আমার! বুঝতে পারছিলাম না কেন! কিন্তু খুব কষ্ট হচ্ছিল বুকে।

ঠাকুরমা সামনে এগিয়ে এসে এবার হাত ধরেছিল আমার। তারপর নরম গলায় বলেছিল, "শেষ পর্যন্ত এই হল!"

কী হল! আমি বুঝতে পারছিলাম না! ঠাকুরমার দিকে তাকিয়ে ছিলাম অবাক হয়ে। ঠাকুরমা বলেছিল, "আমি জানি তুই কোথায় যাচ্ছিস! ঠিক করছিস একদম! তোরও একটা জীবন আছে রাজি। কাজকম্ম সবই থাকবে কিন্তু একজন ভালবাসার লোকও চাই। না, তুই যাকে ভালবাসবি সে লোক নয়, তোকে যে ভালবাসবে তেমন একটা লোক!"

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। সবাই এই কথা বলে। কিন্তু আমার যে আর কাউকে ভালই লাগে না। মনে হয় রিয়ানকে ছাড়া আমার আর কিছু নেই! কেউ নেই! মনে হয় ও নেই বলেই আমার আজকাল আর কলকাতায় থাকতে ইচ্ছে করে না!

আমি কিছু বলতে পারছিলাম না। শুধু তাকিয়েছিলাম ঠাকুরমার দিকে।

"কিছু বলবি না?"

আমি কোনওমতে বলেছিলাম, "তোমায় একটু প্রণাম করব!"

ঠাকুমা বলেছিল, "দূর পাগলি! ওসব করতে হবে না। শুধু আসিস মাঝে-মাঝে। তোকে না দেখতে পেলে কষ্ট হয়।"

"জানি ঠাকুরমা, আমারও হয়," আমার গলা বুজে এসেছিল।

ঠাকুরমা আমার হাতটা ধরেছিল। ঠাণ্ডা, নরম একটা হাত। তারপর বলেছিল, "এত মায়া কেন তোর? এত মায়া করিস না!"

আমি কিছুতেই কথা বলতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল এখানেই ঠাকুরমার পাশে শুয়ে পড়ি। আর কোথাও গিয়ে আমার কাজ নেই!

ঠাকুরমা নরম গলায় সুর তুলে বলেছিল, "তুই ছোটবেলায় জিজ্ঞেস করতিস না কেন আমার সব গল্পের নায়িকার নাম রাজিতা? আর কেন রিয়ানের নামে কোনও নায়ক নেই! এখন বুঝতে পারছিস তো কেন নেই!"

আমি ট্যাক্সির জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। আজ আমায় বাসে উঠতে বারণ করেছে জেঠিমা। জেঠু আমার সঙ্গে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরে দিয়েছিল। আমার হাতে টাকাও গুঁজে দিয়েছিল। আমি না করতে পারিনি। সবার মুখে কেমন যেন একটা তৃপ্তি আর আনন্দ লক্ষ করছি আমি। আমাদের মেঘ-করা বাড়ির ভিতর হঠাৎ যেন পুজোর রোদ উঠেছে!

আমি বাইরে থেকে আসা হাওয়ার ঝাপটা বন্ধ করতে গাড়ির কাচ তুলে দিলাম। আমার ভাল লাগছে না। কিছুই ভাল লাগছে না।

মোবাইলটা বের করে দেখলাম একবার। আকাশ মেসেজ করেছে। আমি ঠিক মতো ট্যাক্সি পেয়েছি কি না! আসছি ক'টায়।

ওদের বাড়ি গোলপার্কের কাছে। আমায় লিখেছে কাছাকাছি গিয়েই যেন ফোন করে দিই। তা হলে পূর্ণদাস রোডের পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে।

AMARBOI.COM

থাকুক, সারা জীবন দাঁড়িয়ে থাকুক। আমার ইচ্ছে করছে সোজা দমদমে গিয়ে একটা প্লেনে চেপে ভৌ করে রিয়ানের কাছে চলে যেতে! কত দিন দেখিনি ওকে। ওর হাতটা ছুঁইনি। থুতনির ওই টোলটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকিনি। কতদিন ওর কথা খাইনি! ওকে বকিনি! কত দিন ওকে বলতে শুনিনি, "গতকাল আসিসনি কেন রাজি?"

গতকাল কেন? আমি তো আর কোনও দিনই যাব না ওর কাছে। ওকে একটা ইমেল করেছিলাম। উত্তর দেয়নি। ওর নাম্বারে একটা ফোন করেছিলাম ওই মাকড়সার কামড়ের কথা শুনে। ফোন বেজে-বেজে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। রিয়ান যেন পুরো মিলিয়ে গিয়েছে হাওয়ায়। মাঝে-মাঝে মনে হয় রিয়ান বলে কি আদৌ কেউ ছিল? সবটাই আমার কল্পনা নয় তো?

সেদিন সন্ধেবেলা কাকিমার কাছে রিয়ানের কথা শুনে আমি যে কী ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম! খালি মনে হচ্ছিল রিয়ানের কাছে তো কেউ নেই! ওর যদি সাংঘাতিক কিছু হয়ে যায়!

কাকিমাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল খুব। আমরা দু'জন দু'জনকে ধরে কাঁদছিলাম। তারপর কাকিমার বড়দা মানে বড় মামা উপর থেকে এসে ব্যাপারটা সামলেছিলেন। আর ভাল ব্যাপার হল তার কিছুক্ষণের মধ্যে আলোও চলে এসেছিল।

মাকড়সা কামড়েছিল রিয়ানকে! এমন তো আমি শুনিনি কোনও দিন! বিষাক্ত মাকড়সা বলতে ট্যারান্টুলার নাম জানি। কিন্তু ব্রাউন রেক্লুজ বলেও মাকড়সা হয়!

রিয়ানের অপারেশন হয়েছে। তারপরেও চিকিৎসা করাতে হচ্ছে। এই মাকড়সার বিষ নাকি খুব বাজে। একবার শরীরে ঢুকলে নানা উপসর্গ তৈরি করে!

কাকিমা বলেছিল, "ওকে খুব করে বলেছিলাম শীতের ছুটিতে আসতে। ও পারবে না। আসতে-যেতে অনেক খরচ! তার উপর ওখানে ছুটিতে এক্সট্রা ক্লাস নেবে। টাকা পাবে। চিকিৎসায় অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। এবার আর আসবে না।"

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "হেল্‌থ ইনশিয়োর করা আছে তো?"

কাকিমা বলেছিল, "গোটাটা কি আর দেয়? বেশ কিছুটা তো নিজেকেই দিতে হয়। জানিস তো গেছেই টাকা ধার করেই। কবে যে আবার ছেলেটাকে দেখতে পাব!"

গড়িয়াহাট ফ্লাইওভার দিয়ে নামার সময় মনে হল আমি হয়তো আর কোনও দিনই দেখতে পাব না রিয়ানকে! রিয়ান যে আর দেখা দিতে চায় না! শেষ দিন তো তাই বলেছিল! বলেছিল, "আর কোনও দিন আমার সামনে আসবি না।"

আমি ট্যাক্সি থেকে নেমে আকাশকে ফোন করলাম। দু'বার রিং হতেই ফোনটা ধরল ও।

আমি বললাম, "এসে গেছি আকাশ।"

"এসে গেছ মানে?" আকাশ অবাক হল, "তোমায় বললাম না নামার কিছু আগে আমায় ফোন করবে? তবে? ঠিক আছে, দাঁড়াও ওখানে। পেট্রোল পাম্পের পাশে একটা ছোট মন্দির মতো আছে, তার পাশে দাঁড়াও। আমি আসছি পাঁচ মিনিটের মধ্যে। কী যে করো! এখন একা-একা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তো!"

আমি ফোনটা কেটে ব্যাগে ঢোকালাম। ট্যাক্সিতে ওঠার সময় জেঠু আমার হাতে একটা বড় মিষ্টির বাক্স ধরিয়ে দিয়েছিল। এটাও জেঠিমার বুদ্ধি। খালি হাতে যেতে নেই কারও বাড়িতে। বাক্সটা বেশ ভারী। জানি না কী মিষ্টি আছে।

আমি চারপাশে তাকালাম। সকাল এখনও দুপুরের দিকে গড়ায়নি। রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরির সামনে বেশ ভিড়। তবে আমার সামনের পূর্বাশস রোডে তেমন গাড়ি নেই। রাস্তাটা কেমন ছায়া-ছায়া, ভেজা-ভেজা। আমার সাউথে এলে ভাল লাগে বেশ। সারা জীবন নর্থে মানুষ তো! তাই সাউথের এই খোলামেলা ব্যাপারটা বেশ অন্যরকম লাগে! মনে হয় নর্থটাকে কেউ যত্ন করে না। আর সাউথ যেন মায়ের হাতে সাজানো বাচ্চা!

"চলো, চলো, আর দাঁড়াতে হবে না।"

আমি আশপাশ দেখতে-দেখতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ আকাশের গলার স্বরে সংবিৎ ফিরল। পাঁচ মিনিটও হয়নি। তার আগেই চলে এসেছে! আমি দেখলাম আকাশ সামান্য হাঁপাচ্ছে। বুঝলাম দৌড়েছে!

আকাশ আমার হাত থেকে মিষ্টির বাক্সটা নিয়ে নিল, "এটা দাও আমায়। আর এসব ফরমালিটিতে দরকার ছিল না কিন্তু!"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। সবে তিনদিন দেখছি ওকে। তার মধ্যেই আকাশ এমন ব্যবহার করছে যেন কত দিন কেউ কাউকে আড়ষ্টতা যাচ্ছে না। বরং কেমন তেতো হয়ে আছে মুখটা। আর আচমকা কেন কে জানে রিয়ানের মুখটা ভেসে উঠছে সামনে।

পূর্বাশস রোড থেকে বাঁ দিকে একটা গলি ঢুকে গিয়েছে। আকাশ আমায় নিয়ে সেই পথে ঢুকল। এই রাস্তাটাও ছায়া-ছায়া। দু'পাশে গাছ। কেমন একটা ঠান্ডা ভাব। আমি ভাল করে আকাশকে দেখলাম। একটা টি-শার্ট আর হাফ প্যান্ট পরে আছে। গালে সামান্য দাড়ি। চুলগুলো উশকোখুশকো!

একটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং কমপ্লেক্সের ভিতর ঢুকলাম আমরা। গেটের করোয়ান আকাশকে দেখে হাসল। আকাশ হাত দিয়ে লিফটটা দেখিয়ে সেইদিকে হাঁটা দিল।

আমি চারপাশটা দেখলাম ভাল করে। বড় বাড়ি। দশতলা তো হবেই। সামনে গাড়ি পার্ক করার জায়গা। পাশে দরোয়ানদের ঘর। দুটো লিফট্ আছে। আকাশ একটা লিফ্‌টের কল-বাটন টিপে অধৈর্য হয়ে পা নাচাচ্ছে!

আমার পা দুটো কেন জানি না অবশ হয়ে এল হঠাৎ! এ কোথায় এলাম আমি? কেন এলাম? সবাই বলল বলেই চলে এলাম! নাকি রিয়ান আমায় অবহেলা করল বলে এমন করে এখানে এসে কিছু একটা দিয়ে শূন্যতা পূরণ করার চেষ্টা করছি? আমার হাত-পা জ্বালা করে উঠল! মনে হল সামনের পৃথিবীটা চলে যাবে! আর আমি বলের মতো চাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ব কোনও অজানা খাদে! আমার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করল! মনে হল রাস্তা দিয়ে যাওয়া কোনও ট্যাক্সি থামিয়ে তার চালককে বলি, "আমায় দমদম নিয়ে যাবেন? প্লেন ধরব!"

আচ্ছা, আমরা যাদের চাই তারা আমাদের চায় না কেন? এ কী ধরনের ষড়যন্ত্র! জোর করে মিলে যাওয়া অঙ্ককে কেন এমন করে গুলিয়ে দেওয়া হয়? আর কে-ই বা দেয়? আমরা যাদের ভালবাসি, তারা আমাদের ভালবাসে না কেন? আমরা কি এতই হেলাফেলার! আমাদের জন্মের সময় বুঝি কারও আনন্দ হয়নি!

লিফ্‌টটা নরম আলোয় মোড়া। চারদিকে স্টেনলেস স্টিলের পাত ঝকঝক করছে। আকাশ ছ'তলার বাটন টিপল।

মসৃণভাবে উঠে গেল লিফ্‌ট। আকাশ শুধু বলল, "আজ তোমায় এতটা সুন্দর দেখাচ্ছে কেন?"

আমি নাঁ, লজ্জা পেলাম না। পা কাঁপল না আমার। কান গরম হল না। মনে হল কেউ যেন জিজ্ঞেস করল ক'টা বাজে! আমি শুধু ভদ্রতা রক্ষা করতে জোর করে হাসলাম।

টিং শব্দে লিফ্‌টটা থামল ছ'তলায়। আকাশ বাইরে বেরিয়ে দাঁড়াল আমার জন্য। আমি শাড়ি সামলে নিয়ে টুপ্‌ করে বেরোলাম। সামনেই লম্বা দেওয়াল। তাতে সার-সার মানুষের মুখের ছবি ফ্রেম করে বাঁধানো। এই তলাটা একদম নির্জন!

লিফ্‌টটা বন্ধ হয়ে আবার নেমে গেল নীচে। আমি দেখলাম আকাশ দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমার অস্বস্তি হল। এমন করে তাকাচ্ছে কেন? আমি বলতে গেলাম, 'কী, যাবে না?' কিন্তু তার আগেই হঠাৎ আকাশ এগিয়ে এল আমার কাছে। তারপর "এক্সকিউজ মি" বলে আচমকা হাত দিয়ে

AMARBOI.COM

আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরে টেনে নিল ওর কাছে। তারপর ঠোঁটটা চেপে ধরল ঠোঁটে।

ব্যাপারটা এমন করে ঘটল যে, আমি বুঝতেই পারলাম না কী হল। আমি শুধু বুঝলাম আকাশ চুইংগাম খাচ্ছে। আর বুঝলাম ওর দাড়ি কাটা উচিত রোজ!

কতক্ষণ আকাশ আমায় ধরে ছিল, জানি না। কিন্তু যখন ছাড়ল, দেখলাম ওর ফরসা মুখটা টকটকে লাল হয়ে গিয়েছে। শ্বাস দ্রুত!

"আয়াম সো সরি। কিন্তু তোমায় এমন লাগছে! আমি রেক্রিস্ট করতে পারলাম না," আকাশ ঘন গলায় কোনওমতে বলল কথাগুলো।

তারপর আরও কীসব যেন বলল। কিন্তু প্রথমটুকু ছাড়া আর কিছুই কানে ঢুকল না আমার। আমি শুধু ওই সার বাঁধা ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম প্রত্যেকটা ছবি থেকে রিয়ান গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

বারো

রিয়ান

এখানে একা হাঁটলে হাওয়া কানে বাজে। বুঝি কতটা নির্জন চারপাশ! আশপাশের সাজানো বাড়িঘরের মধ্যে একটা খুলনা-খুলনা ব্যাপার আছে। কিন্তু সবটাই কেমন যেন পরিত্যক্ত শহর মনে হয়। না, লোকজন যে দেখি না, তা নয়। কিন্তু এত কম যে ভাবা যায় না।

আমার ঘরের সামনে একটা ছোট প্যাটিও আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকাই। এমনও সময় গিয়েছে যখন দেখেছি দু'ঘণ্টায় সেই রাস্তা দিয়ে মাত্র চারজন লোক গিয়েছে!

আজ শনিবার। কলেজ ছুটি। কিন্তু পরীক্ষা চলছে। ফলে পড়াশোনাও চলছে পুরোদমে। গতকাল রাতে নানিয়া ছিল আমার এখানে। দু'জনে পড়েছি সারা রাত। তারপর ভোরের দিকে নানিয়া চলে গিয়েছে। আমিও একটু ঘুমিয়ে নিয়েছি।

এ সপ্তাহের বাজার করার দায়িত্ব ছিল আমার। তাই সকাল আটটা নাগাদ শরথ উঠিয়ে দিয়েছিল ঘুম থেকে।

বাজার বলতে কাছের বড় গ্রোসারি। ওখানে সবটাই পাওয়া যায়। মাছের ফিলে, কিছু তরকারি, চাল আর মশলাপাতি নিয়ে এসেছিলাম। তারপর স্নান করে রান্না সেরে আবার পড়তে বসে গিয়েছিলাম।

গতকাল নানিয়ার সঙ্গে পড়ার সময় দুটো অঙ্ক মিলছিল না। আজ পড়তে বসে সারা দুপুর ধরে সেই দুটো মিলিয়েছি। সঙ্গে আরও কিছু থিয়োরি রিভাইস করে নিয়েছি। সোমবারের পরীক্ষা খারাপ হবে না।

এখানে আর কিছুই করার নেই। শুধু পড়তে হয়। খারাপ রেজাল্টের কোনও জায়গা আমার জীবনে নেই!

বিকেল চারটে নাগাদ আর পড়তে ইচ্ছে করেনি। তাই বইপত্তর গুটিয়ে বেরিয়েছি একটু হাঁটতে।

বড় রাস্তার পাশের সাইড ওয়াকগুলো বেশ চওড়া। তাতে আবার কিছুটা অংশ ঘাস বোনা থাকে।

আমার কিছুই করার নেই। পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটছি। ঠান্ডা পড়ে গিয়েছে বেশ। এখানে শীতে কখনও-কখনও বরফও পড়ে! এবার কি পড়বে?

ছোটবেলায় একবার সবাই মিলে লাভা, লোলেগাঁও আর রিশপ গিয়েছিলাম। শীতকাল ছিল সেটা। ডিসেম্বরের শেষ। রিশপে সেবার তুষারপাত হয়েছিল। রাজিতা আর আমি কাঠের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কীভাবে আকাশ থেকে কটন ক্যান্ডির মতো তুষার নামছে! ধীরে, নিশ্চুপে তারা জমে যাচ্ছে পপলার গাছের পাতায়, কাঠের রেলিং, বাড়ির ছাদে, পথের ধুলো-মাটিতে। আর আমাদের চোখের সামনে ধীরে-ধীরে কেমন যেন সাদা হয়ে গিয়েছিল চরাচর!

রাজিতা আমার হাতটা চেপে ধরেছিল। ঠিরঠির করে কাঁপছিল ও। তুষারের যাতে ঘুম না ভাঙে, তেমন গলায় কথা বলছিল। আমার মনখারাপ করছিল খুব। কেন করছিল, জানি না। শুধু জানি, আস্তে-আস্তে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া আকাশ আর টনটনে একটা চাঁদের থেকে ছড়িয়ে পড়া জ্যোৎস্নার নিচে এমন একটা সাদা তুষারের জনপদ আমার বুকের ভিতরও মাথা তুলছে!

সামনেই একটা লোকান আছে। আমি যাতায়াতের পথে দেখেছি। নাম, 'কন্তোম সেন্স'। শরথ বলেছিল, ওটা সেক্স টয় শপ। ও ঢুকে দেখেছে। আমাকেও জোরাজুরি করেছিল নিয়ে যাবে বলে। আসলে শরথ ছেলেটা খুব অদ্ভুত! কখন যে কী করে আর কী বলে ঠিক নেই! আজ যেমন সকালে আমায় ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বলেছিল, "তুই একটা রাক্কেল! কাল নানিয়া ছিল সারা রাত। ওর সঙ্গে শুতে পারলি না?"

আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, "মানে! কী বলছিস তুই?"

শরথ বলেছিল, "আমি মাঝে-মাঝে পড়া থেকে উঠে এসে তোর দরজায় কান পাতছিলাম! খালি পড়া আর পড়া! ভাবলাম তোরা করবি। তোর দ্বারা কিছু হবে না!"

আমি চুপ করে গিয়েছিলাম। নানিয়ার সঙ্গে আচমকা ঘটে যাওয়া ঘটনাটা মনে পড়ে গিয়েছিল। আমি তাই কথা বলতে পারছিলাম না।

শরথ সেসব লক্ষ করেনি। আসলে ও নিজের অরিবিট থাকে। ওর যা বলার বলে। বাকি কে কী উত্তর দিল, কী দিল না, সেসব নিয়ে ভাবে না বিশেষ!

সকালে আমায় আবার বলেছিল, "তা হলে তোর আর নানিয়ার মধ্যে কিছু নেই?"

আমি মাথা নেড়ে বলেছিলাম, "না, নেই!"

"তোর অন্য কোনও গার্লফ্রেন্ড আছে?"

আমি আবার চুপ করে গিয়েছিলাম। চোখের সামনে একটা মুখ ঝলসে উঠেছিল হঠাৎ! বুকের ভিতরটা আচমকা মোচড় দিয়ে উঠেছিল!

গতকাল কী হয়েছে আমার! কেন ওর কথা সবসময় মনে পড়ে? ওর ইমেলে রিপ্লাই দিই না! ফোন রিসিভ করি না। যত দূরে যেতে চাই, সরে যেতে চাই, তত কেন বারবার মনে পড়ে ওর কথা? কী হচ্ছে আমার সঙ্গে? ওর কথা মনে পড়লেই আর কোনও কিছু করতে ইচ্ছে করে না কেন? জোর করে সরে থাকি। কিন্তু মনে-মনে সরে থাকতে পারছি না কেন আজকাল!

শরথ এবারও খেয়াল করেনি যে, আমি উত্তর দিচ্ছি না। ও হেসে বলেছিল, "তা হলে বলছিস আমি ট্রাই মারতে পারি? কী রে?"

আমি বলেছিলাম, "সেই টিফানিবউদির কী খবর?"

শরথ বলেছিল, "কথা ঘোরাবি না!"

আমি তাকিয়েছিলাম ওর দিকে। তারপর বলেছিলাম, "নানিয়ার কথা ভেবে দু'বার ফ্যান্টাসাইজ করে নে। তারপরও যদি ট্রাই মারার ইচ্ছে হয়, তখন বলিস!"

শরথ দু'মিইল লম্বা হাসি দিয়ে বলেছিল, "আমি এত দিন তবে কী করলাম বলে তোর মনে হয়?"

আমার সামনে এক ভদ্রলোক দুটো বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে হাঁটছেন। মেয়েদুটোর বয়স বড় জোর ছয় কি সাত। গায়ে জ্যাকেট। মাথায় চুলো। আর দু'জনেরই হাতে দুটো করে গ্যাস বেলুন। বাচ্চাদুটো ক্রমাগত কচিরমিচির করে কথা বলে চলেছে। আর ভদ্রলোক যথাসম্ভব তার উত্তর দিচ্ছেন। বুঝলাম, বাবা আর মেয়ে।

আমার ভাল লাগল খুব। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার ছোটবেলার কথা। আমিও বাবার সঙ্গে এমন করে হাঁটতাম। ময়দানে বাবাও এমন একবার আমায় এক গোছা গ্যাস বেলুন কিনে দিয়েছিল। বলেছিল, "ভাল করে ধরে রাখ। না হলে কিন্তু উড়ে চলে যাবে!"

আমার কী ভাল লেগেছিল সেদিন! কত রঙের বেলুন। আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে! আমি বেলুনগুলো মুঠোয় ধরে খুব দৌড়েছিলাম এদিক-ওদিক। বাবা হাসছিল আমায় দেখে। ঘাসে বসে একটা ভুট্টা

AMARBOI.COM

ছাড়াতে-ছাড়াতে বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলছিল, "আস্তে রিয়ান, পড়ে যাবি কিন্তু! সাবধানে।"

সে সব অসাবধানতার বয়স। ভয় না পাওয়ার বয়স! জীবনকে বিশ্বাস করার বয়স!

আমি শুনিনি। হাতের মুঠোয় বেলুনগুলো ধরে খুব ছুটে বেড়াচ্ছিলাম! আর তখনই বিপত্তিটা ঘটেছিল।

ঘাসের ভিতর লুকোনো ছোট একটা ইটের উপর পা পড়ে আমি ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলেছিলাম! আর ব্যাস, মাটিতে ছিটকে পড়ে গিয়েছিলাম একদম!

বাবা উঠে এসেছিল কাছে। লেগেছে কি না দেখছিল। আমি কিন্তু ওসব নিয়ে ভাবছিলাম না। শুধু দেখছিলাম আমার হাতের মুঠো ছাড়িয়ে বেলুনগুলো উঠে যাচ্ছে আকাশে। শেষ বিকেলের রঙে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া আকাশে!

শুধু একটা, মাত্র একটা বেলুন আমি ধরে রাখতে পেরেছিলাম হাতে! পড়ে গিয়েও সেই হলুদ রংয়ের বেলুনটা আমার আঙুলে জড়িয়ে ছিল!

পকেটের ভিতর কুড়কুড় করে ফোনটা নড়ে উঠল। এখন আবার কে? আমি ফোনটা বের করলাম। আরে, সামুদা!

"হ্যাঁ দাদা, বলো," আমি ফোনটা কানে লাগালাম।

সামুদার গলাটা কেমন যেন লাগল, "তুই কোথায়?"

"আমি একটু হাঁটতে বেরিয়েছি! বলো না, কী হয়েছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সামুদা বলল, "আসতে পারবি একটু?"

আমি সামান্য ইতস্ত করলাম। যাওয়াই যায়, কিন্তু পড়াশোনা করব যে! সোমবার পরীক্ষা। ভেবেছিলাম ঘণ্টাখানেক হেঁটে গিয়ে আবার পড়তে বসব! কিন্তু সামুদার কাছে গেলে তো সেটা আর হবে না।

সামুদা রেগে বলল, "আসতে বলছি আর ঢামনামো করছিস!"

"আসছি সামুদা, রাগ কোরো না," আমি তাড়াতাড়ি বললাম।

গলা শুনে বুঝতে পারছি সামুদা আগেসটে হয়ে আছে। আর আগেসটে হয়ে গেলে সামুদা যা খুশি তাই বলে। এমনকী কলকাতায় থাকার সময় তো চড়-চাপড়ও মারত!

"উবের ধরে চলে আয়। আর আসার পথে স্টারবাক্স থেকে কফি নিয়ে আসবি। টাকা আমি দিয়ে দেব।"

আমায় আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সামুদা কট করে ফোনটা কেটে দিল!

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। সামুদার হঠাৎ কী হল। প্রথম-প্রথম সামুদার সঙ্গে একটু যোগাযোগ থাকলেও এখন কাজের চাপে খুব একটা যোগাযোগ হয় না। সামুদাও করে না। তা হঠাৎ আজ কী হল বুঝতে পারলাম না!

আমি ফোনের অ্যাপ থেকে একটা গাড়ি ডেকে নিলাম। যেতে যখন হবেই তখন আর দেরি করে লাভ নেই!

আমি হিসেব করে নিলাম যে, যাওয়ার পথে লাভার্স লেন আর গ্রিনভিলের ক্রসিংয়ের ওই কফির দোকানটা থেকে কফি নিয়ে নেব। এই দেশে স্টারবাক্স থেকে কফি খাওয়ার খুব ক্রেজ দেখি।

সকালবেলা অফিস যাওয়ার পথে সবাই গাড়ি নিয়ে কফি শপের ড্রাইভ ইনে দাঁড়িয়ে পড়ে। মাঝে-মাঝে এত বড় লাইন হয়ে যায় যে, দেখলে অবাক লাগে!

এ দেশে কাজ শুরু হয় সকাল-সকাল। আবার বিকেল পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সব শেষ হয়ে যায়। সন্ধেবেলা রেসিডেন্সিয়াল এলাকাগুলো দেখলে তো মনে হয় মফস্সলের রাত! টিমটিম করছে দূরে-দূরে আলো! রাস্তা প্রায় ফাঁকা। আমার প্রথম-প্রথম খুব অবাক লাগত। এখন আর সেসব ভাবি না। বরং আমার নিজেরও রাতের খাবারের সময়টা কী করে যেন সাড়ে আটটা হয়ে গিয়েছে!

গাড়িটা চলে এল দু'মিনিটের মধ্যেই। গাড়িতে উঠে সামুদার বাড়ির ঠিকানাটা বলে বললাম যে লাভার্স লেন হয়ে যেন গাড়িটা যায়। কফি নিতে হবে।

গাড়ির চালক ভদ্রলোকের বয়স ষাটের উপর। আমি বুঝতে পারলাম না ভারতীয় না পাকিস্তানি! আমার নির্দেশ শুনে ভদ্রলোক গাড়ি স্টার্ট করলেন।

রাস্তাটার নাম লাভার্স লেন হলেও মোটে তা আমাদের দেশের মতো গলিঘুঁজি নয়। বরং বেশ বড় আর চওড়া রাস্তা। ওয়ান ওয়ে ধরনের দুটো দিক। আর দু'রাস্তার মাঝে ঘাসের আইল্যান্ড করা। তাতে আলো লাগানো!

"ইন্ডিয়ান? বেঙ্গলি?"

আমি দেখলাম রিয়ার ভিউ মিরর দিয়ে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে আছেন!

আমি হেসে বললাম, "হ্যাঁ।"

ভদ্রলোক বললেন, "আমিও ভারতীয়। তবে উত্তর প্রদেশের লোক!"

আমি হাসলাম শুধু। এই দেশে এসে দেখছি দুমদাম অনেকেই যেজুরে আলাপ শুরু করে দেয়! আমি তো অভ্যস্ত নই, তাই কেমন একটা লাগে!

ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম হরিলাল মিশ্রা।"

আমি আবারও হাসলাম। কী আর বলব!

ভদ্রলোক কিছু তাও দমলেন না। বললেন, "স্টুডেন্ট, না? আমি কিন্তু পালিয়ে, কাজ খুঁজতে এসেছিলাম এখানে। হাতে প্রায় কোনও টাকা-পয়সাই ছিল না। আই ওয়াজ আ বেগার!"

"তাই!" আমি সোজা হয়ে বসলাম।

হরিলাল যেন আরও উৎসাহ পেলেন, "আমেরিকান ড্রিম! কিন্তু তোর তলায় যে কত নাইটমেয়ার লুকোনো আছে, তা কি আর দূর থেকে বোঝা যায়? এই যে তুমি পড়তে এসেছ, যেমনটা ভেবে এসেছিলে তেমন কিছু কি হল?"

আমি দীর্ঘশ্বাস চেপে মাথা নাড়লাম। কথাটা ভদ্রলোক খারাপ বলেননি।

লাভার্স লেন আর গ্রিনভিলের ইন্টারসেকশনের স্টারবাক্স থেকে কফি নিতে বেশি সময় লাগল না। আমি সাবধানে কফির গ্লাসটাকে তার ঢাকনা সমেত হাতে ধরে বসলাম।

হরিলাল বললেন, "তুমি নিজের জন্য নিলে না?"

আমি মাথা নাড়লাম, "আমি খাই না।"

হরিলাল আবার রিয়ার ভিউ মিরর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, "জানো, আমি যখন প্রথম এদেশে আসি লিটারালি রাস্তায় থাকতাম। শিংগুরার দোকানগুলোর সামনে শুতাম! দিনের শেষে ওদের ফেলে দেওয়া খাবারের টুকরো কুড়িয়ে খেতাম। ভাবতে পারো? এটা খাব, ওটা খাব না, এসবের কোনও অপশন ছিল না! আমি ব্রাহ্মণ। দেশে কত নিয়ম মানতাম! কিন্তু এখানে সব খেয়েছি! বাঁচতে হবে তো!"

"কেন? কেন এমন করেছেন?" আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না।

হরিলাল মাথা নেড়ে হাসলেন। তারপর বললেন, "ভালবাসার জন্য! আজ এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সের আমায় দেখলে বোঝা যাবে না। কিন্তু ভাই, আমারও যৌবন ছিল! আমারও একজন ছিল! তার জন্য এসেছিলাম এদেশে! আমাদের ওখানের জোতদারের মেয়ে ছিল সে। আমি গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে। মেরে পুঁতে দিত আমায় যদি না পালাতাম। অনার কিলিং শুনেছ তো? ওখনকার দিনে আরও বেশি হত। এখানে এসে প্রথম ছ'বছর সব করেছি! এমনকী, হোর হাউজেও কাজ করেছি! তারপর আস্তে-আস্তে ভাগ্য ফেরে। আজ আমার সারটে গাড়ি। দোকান, বাড়ি সব আছে। দুই ছেলে। নাতি-নাতনি নিয়ে ভরা সংসার!"

আমি অবাক হয়ে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। দেখলে কে বলবে এমন গল্প আছে মানুষটার! ছোটখাটো চেহারা। মাথায় টাক। আস্তে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্তে কথা বলেন! কিন্তু এমন ছোটখাটো চেহারার ভিতরে যে এমন একটা তেজ লুকিয়ে ছাপে, কে বলবে! বিদেশ-বিভুঁইয়ে নিজের জায়গা খুঁজে পাওয়া যে কী কঠিন ব্যাপার, যারা ঘরের ভিতর লেপের আড়ালে বসে জীবন কাটায়, তারা বুঝবে না!

আমি বললাম, "আর যার জন্য এত কিছু, সে?"

হরিলাল এই প্রথম মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন আমায়। তারপর হেসে বললেন, "গেস!"

"আপনি গিয়ে তাকে পরে বিয়ে করেছেন," আমি ঝুঁকে পড়ে সামনের সিটের ব্যাক রেস্টটা ধরলাম।

শব্দ করে হাসলেন হরিলাল। বললেন, "মেরা লাইফ হিন্দি ফিল্ম নেহি হ্যায় বেটা। ও আমায় ছেড়ে দিয়েছিল। কাল আগেন আসার ছ'মাসের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায় ওর। আমি এখানেই বিয়ে করেছি একজন মেক্সিকান মহিলাকে। কিন্তু লালিকে ভুলিনি আজও! আমি গরিব বলে এমনটা করতে পেরেছিল ওরা! তাই জান দিয়ে খেটেছি, যাতে আমিও পয়সা করতে পারি! নাথিং ইক্ব শার্পার দ্যান ব্রোকেন পিসেস অব লাভ! ডোন্ট এভার লেট ইয়োর লাভ লিভ ইউ। এখন ভাবি আমি তো ওখানে থাকতেই পারতাম! চেষ্টা করতেই পারতাম! কী হত? মেরে দিত? দিত! মুখে ভাগনা নেই ছাইয়ে থা!"

কথাটা শেষ করে বেশ কিছুক্ষণ কেন চুপ করে গেলেন হরিলাল মিশ্রা! শেষের কথাগুলো যেন আমায় নয়, নিজেকেই বলছিলেন!

আমি পিছিয়ে বসলাম! খুব অবাক লাগল! কোথাকার হরিলাল মিশ্রা আর কোথাকার রিয়ান মুখার্জি! একটা ছোট্ট ট্র্যাঙ্গি কীভাবে দু'জনের জীবনকে কাটাকুটি করে দিল! কেন আমার দেখা হল হরিলাল মিশ্রার সঙ্গে? কেন আমার ঘরের সামনের ওই অন্ধকার গাছের আদলে কেউ একজন অপেক্ষা করে? জীবন কী বলতে চাইছে আমায়? কার কথা বলতে চাইছে? সত্যি কি এই দেশ এতটা একাং না আমারই কোনও এক কারণে আরও একা লাগছে?

সামুদার বাড়ির সামনে নেমে ট্যাক্সি মিটিয়ে দিলাম আমি। হরিলাল যাওয়ার আগে বললেন, "ছুটির দিনে আমি নিজে গাড়ি চালাই। ভাল লাগে। তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল খুব!"

আমি বললাম, "আমারও!"

হরিলাল বললেন, "খুশ রহো!"

গাড়িটা চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ওই দিকে। তারপর সামুদার বাড়ির দিকে এগোলাম। দেখি কী বলতে চায় দাদা! আর ঠিক তখনই কুড়কুড় করে উঠল পকেটের ফোনটা। এখন আবার কে! বের করে দেখলাম নানিয়া!

"বল," আমি ছোট করে বললাম।

নানিয়া বলল, "ওই অন্ধটা হয়েছে? আমি পারছি না!"

আমি বললাম, "হ্যাঁ হয়েছে। আমি তোকে মেল করে দেব।"

নানিয়া বলল, "না, কাল যাব তোর কাছে। তখন দেখে নেব। আর একটা কথা। তোকে সুরিন্দর ফোন করতে পারে। মানে ওর কেন যেন মনে হয়েছে আমার সঙ্গে তোর কিছু সম্পর্ক আছে। তুই কিন্তু ঘাবড়াবি না!"

আমার হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। একদিন এই সুরিন্দর অন্য মেয়ের সঙ্গে শুয়েছে বলে নানিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে আমার কাছে এসেছিল। আর আজ গঙ্গা উলটো বইছে!

বললাম, "ঠিক আছে। এখন রাখছি।"

"খুব তাড়ায় আছিস মনে হচ্ছে?" নানিয়া যেন বিরক্ত হল।

আমি বললাম, "সামুদার এখানে এসেছি। কাল আয়, কথা হবে। বাই।"

ফোনটা কেটে আমি হাসলাম নিজের মনে। আজকাল আবার আগের মতো সহজ হয়ে গিয়েছে নানিয়া। অতীত নিয়ে আমরা আর কথা বলি না। তবে এ ব্যাপারে আমার কৃতিত্ব নেই কোনও। যা করেছে, নানিয়াই করেছে।

টমের বাড়িতে সেদিন নানিয়াকে দেখে আমি খুবই অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলাম।

নানিয়া বলেছিল, "কী রে, কেমন আছিস?"

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। তাকিয়েছিলাম শুধু।

নানিয়া বলেছিল, "শুনলাম স্পাইডারম্যান হয়ে গেছিস? সত্যি! দেওয়াল বেয়ে হাঁটতে পারিস?"

মাকড়সা কামড়ানোর পর এটা একটা কমন জোক হয়ে গিয়েছে আমায় নিয়ে! তাও আমি মনে-মনে আশ্বস্ত হয়েছিলাম।

নানিয়া আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ঘরের কোনায়। বলেছিল, "দেখ রিয়ান, আমার আর এসব ভাল লাগছে না!"

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। মাথা নিচু করে নিয়েছিলাম।

নানিয়া বলেছিল, "মাথা নামালে হবে না। আমরা খুব ভাল বন্ধু। একটা বিকেল সেটাকে নষ্ট করে দিতে পারে না। আই ওয়াঙ্ক মেন্টাল ডিসটার্বড! তাই কিসের থেকে কী হয়ে গেছে! আমার দোষ নেই। তোরও না। প্রেমে ধাক্কা খেলে এমন রিবাউন্ড হয়।"

আমি এবার তাকিয়েছিলাম নানিয়ার দিকে। তারপর বলেছিলাম, "তুই কি কথাগুলো আমায় বলছিস, না নিজেকে কনভিন্স করছিস? শোন, আমার তার সঙ্গে কোনও মেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট হয়নি। সেক্স হয়েছে, কিন্তু সেটা অ্যাব্রিডেন্ট!"

"তা হলে আমার সঙ্গে কথা বলিস না কেন?" নানিয়া রাগ করে তাকিয়েছে আমার দিকে।

আমি বলেছিলাম, "তুই নিজেই পালাতিস। মুখ ঘুরিয়ে নিতিস। যেন আমি তোকে কী না কী করে দেব! আমার খারাপ লাগত। তাই কথা বলিনি।"

নানিয়া হেসেছিল এবার। তারপর বলেছিল, "আবার যদি কোনও দিন সেক্স হয়ে যায়, আবার এমন করবি?"

আমি তাকিয়েছিলাম ওর মুখের দিকে। বলে কী মেয়েটা!

নানিয়া হেসে চোখ টিপে বলেছিল, "তোর আফটারশেভটা ব্যাপকটা!"

তারপর থেকে নানিয়ার সঙ্গে আবার ভাব হয়ে গিয়েছে। তবে একটা জিনিস দেখছি। নানিয়া এখন খুব গায়ে হাত দিয়ে কথা বলে। কেন, সেটা জানি না! জীবনে বোধ হয় সবটা জানতেও নেই। বুঝতেও নেই। কিছু-কিছু জিনিস অস্পষ্টভাবেই ছেড়ে দিতে হয়।

আমায় দেখে সামুদা ভুরু কুঁচকে বলল, "দেরি করলি কেন?"

আমি হাসলাম, "কফি নিয়ে এলাম তো। তাই।"

সামুদা কফিটা হাত থেকে নিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর আচমকা কানটা ধরল। বলল, "তুই শালা খুব তালেবর হয়ে গিয়েছিস, না?"

আমি ঘাবড়ে গেলাম। সামুদা মারছে কেন আমায়?

"আরে, আরে, কী হয়েছে?" আমি মুখটা বিকৃত করে বললাম।

"গত এক সপ্তাহ কাকিমাকে ফোন করিসনি?"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। কথাটা ঠিক। মাকে ফোন করা হয়নি। কিন্তু মাকে তো বলেছিলাম এমনটা হবে। তবে!

সামুদা কানটা ছেড়ে আমায় এক ধাক্কায় সোফায় বসিয়ে দিয়ে বলল, "সবাই ভালবাসে বলে সাপের পাঁচ পা দেখেছিস? কেন ফোন করিসনি কাকিমাকে? আর কাকিমা যখন ফোন করেছে, তখন তুলিসনি? গতকাল কাকিমা আমাদের বাড়ি গিয়ে খুব কেঁদেছে! তুই নাকি ঠিকমতো ফোন করিস না। করলেও দু'মিনিট কথা বলে রেখে দিস!"

আমি মাথা নিচু করে নিলাম।

সামুদা বলল, "পোঁদে লাথি মেরে এই দেশ থেকে বের করে দেওয়া উচিত তোকে। জানোয়ার!"

আমি বললাম, "সামুদা, রাগ কোরো না প্লিজ!"

সামুদা আমার সামনে বসে পড়ল। বলল, "ছোটবেলায় মাজা দিতে কে শিখিয়েছে তোকে? সিটি মারার কায়দা কে শিখিয়েছে? ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার কে বানিয়েছে? ফেলুদা কে পড়িয়েছে? হলিউড কে চিনিয়েছে? আমি, এই আমি। আমি তোর উপর রাগ করতেই পারি।"

আমার কেন জানি না আচমকা চোখে জল চলে এল। বললাম, "পারো তো সামুদা, তুমিই পারো। আমি কখনও অস্বীকার করেছি?"

AMARBOI.COM

"শোন, মুখে অস্বীকার করার ব্যাপার নয় রিয়ান। মুখে স্বীকার করার ব্যাপারটাই আমার কথা বলছি না। মায়ের কথা বলছি। তোর পরীক্ষা থাক, যা-ই থাক, মাকে ফোন করবি না? এখানে কী করতে এসেছিস? পড়তে? নাকি অমানুষ হতে?"

আমি বললাম, "আমার ভুল হয়ে গেছে সামুদা। আমার মাথার ভিতর সবসময় কী হয় তুমি জানো না। আমি কি শুধু নিজের জন্য এসেছি? মায়ের জন্য আসিনি? এদেশে আমি মাকে নিয়ে আসব। ওই দেশ কী দিয়েছে আমায়? আমার যা ছিল সবটাই তো..."

সামুদা কথা শেষ করতে দিল না। বলল, "শোন, তুই একা নোস যে, অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়েছে।"

আমি বললাম, "তুমি আমার সঙ্গে ছিলে সামুদা। ভুলে গেলে সেই দিনটা? আমতলার ওই..."

"চুপ কর!" সামুদা চিৎকার করল, "আর কত দিন মৃতদেহ গলায় ঝুলিয়ে ঘুরবি? শুধু মা, না? আর রাজিতা? ওর কী হবে?"

আমি কিছু না বলে চুপ করে গেলাম। সামুদা কফিটা নিয়ে এসে বসল আমার পাশে। বলল, "তুই জানিস না, না?"

আমি তাকালাম সামুদার দিকে।

সামুদা বলল, "আজ মা ফোন করেছিল আমায়। তখনই বলল। কাকিমাই থেকে জেনেছে কথাটা।"

"কী জেনেছে?" আমি তাকালাম সামুদার দিকে।

সামুদা কফিতে চুমুক দিয়ে তাকাল আমার দিকে। তারপর কেটে-কেটে বলল, "রাজিতার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। সামনের ফাল্গুনে সম্ভবত।"

আমি আচমকা স্থির হয়ে গেলাম। মনে হল শিরার ভিতর সমস্ত হিমোগ্লোবিন এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। কোষে-কোষে কাজ বন্ধ করে দিল মাইটোকনড্রিয়া। সমস্ত স্নায়ুর আদানপ্রদান থামিয়ে দিল নিউরন। আমি জড় বস্তুর মতো তাকিয়ে দেখলাম আমার সামনে সামুদা নেই, ডালাসের অ্যাপার্টমেন্ট নেই, বরাচ জুড়ে একটা মাঠ পড়ে আছে শুধু। আর সেই মাঠে বহুদিন আগের সেই বাচ্চা ছেলেটা পড়ে আছে মাটিতে। আজ তার আঙুল থেকে খুলে গিয়েছে সুতোর। তার শেষ গ্যাস বেলুনটা তাকে ছেড়ে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে আকাশে। শীতকাল ছাড়িয়ে আরও দূর কোনও এক বসন্তের আকাশে!

তেরো

রাজিতা

"Even after you ruined me for any other,
I cannot regret you. Even as I cleave
the flesh of wanting from the bone,
I hope the night sky is pretty
wherever you are."

আজ সব গুছিয়ে ফেলার দিন। জীবনে যা কিছু কষ্ট দেয়, যা কিছু ক্ষত তৈরি করে সেই সব জিনিসগুলোকে সরিয়ে ফেলার দিন। এই শহর একটা বড় চিলেকোঠা। তার মধ্যে আজ নিজস্ব আর-একটা চিলেকোঠা করার দিন। তারপর সব স্মৃতি গুনে-গেঁথে সেইখানে চাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখে চাবিটা হারিয়ে ফেলার দিন।

আমি আবার খাতাটা উলটে দেখলাম গোটা-গোটা হাতের লেখায় লেখা আছে কবিতাটা। এমন আরও অনেক কবিতাই আছে এই খাতায়। কিন্তু শেষবারের মতো উলটোতে গিয়ে কেন যে এই পাতাটাই সামনে খুলে গেল কে জানে!

রিয়ানের খাতাটা আমায় দিয়েছিল কলেজে পড়ার সময়। কোনও ভাল কোটেশন দেখলেই ও সেটা লিখে রাখত এই খাতায়।

সেবার আমার জন্মদিন ছিল। ওকে নেমন্তন্ন করেছিল মা। কিন্তু যথারীতি আসেনি। তাই বিকেলের দিকে আমি নিজেই টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার ভরে নিয়ে গিয়েছিলাম ওদের বাড়ি।

নিজের ঘরে বসে ছিল রিয়ান। দেখেছিলাম জানালা দিয়ে আসা অল্প আলোয় ও একটা বই খুলে কীসব হিজিবিজি দাগ কাটছিল তার পাতায়!

আমায় দেখেই কেমন যেন গম্ভীর আর বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। আমি জানি না কেন, কিন্তু ক্লাস টেন পাশ করার পর থেকেই রিয়ান আমার সামনে কেমন যেন কাঠ-কাঠ হয়ে থাকত। জিজ্ঞেস করলেও সরাসরি কিছু বলত না। বরং রাগ করে বলত, "আমার কাছে কেন থাকিস সবসময়? এত ছেলে ইট পেতে রয়েছে, তাদের সঙ্গে আড্ডা দে!"

আমি গায়ে মাখতাম না। তাই সেই বিকেলেও গায়ে মাখিনি।

আমি বলেছিলাম, "জানতাম তুই ডুর মারবি, তাই আমি খাবার নিয়ে এসেছি।"

রিয়ান বলেছিল, "মা তোকে এঘরে আসতে বারণ করেনি? বলেনি, আমি কাজ করছি?"

আমি বলেছিলাম, "হ্যাঁ বলেছিল। কিন্তু আমি শুনিনি।"

"কেন শুনিসনি?" রিয়ান বিছানা থেকে রাগ করে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল আমার সামনে।

আমারও রাগ হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ। বলেছিলাম, "বেশ করেছি। কী করবি? মারবি? সাহস আছে আমার গায়ে হাত দেওয়ার! এত করি তো, তাই পাত্তা দিস না, না? কী ভাবিস নিজেকে?"

রিয়ান বলেছিল, "যা ভাবি তা তোকে বলব কেন? কে তুই?"

"আমি কে! জানিস না আমি কে?" আমার যে কী হয়েছিল সেদিন জানি না। মাথার ভিতর বোধ হয় একটা ঘূর্ণি ঢুকে পড়েছিল।

রিয়ান চোয়াল শক্ত করে তাকিয়েছিল আমার দিকে, "ঝগড়া করতে এসেছিস?"

আমি আচমকা ওর জামার বুকের কাছটা খামচে ধরে বলেছিলাম, "বেশ করব, ঝগড়া করব!"

ঘরের আলো আঁধারির ভিতর রিয়ান যেন কেমন পাথরের মূর্তি হয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর আচমকা আমায় কোমর ধরে টেনে নিয়েছিল নিজের কাছে। ঠোঁটের উপর চেপে ধরেছিল ওর ঠোঁট!

আমি প্রথমটায় বুঝতে পারিনি কী হচ্ছে। তারপর আমিও আঁকড়ে ধরেছিলাম ওকে। ওর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলাম নিজেকে। ওর আচ্ছন্নতার শেষের গন্ধটা কেমন যেন অবশ করে দিয়েছিল আমায়। আর নিজের অজান্তেই রিয়ান আমার কোমর ধরে কিছুটা তুলে নিয়েছিল মাটি থেকে।

জানি না কতটা সময় আমরা এক হয়ে ছিলাম। তখন মনে হয়েছিল অনন্ত মুহূর্ত ঢুকে গিয়েছে ওই ছোট্ট বিকেলটুকুর মধ্যে। কিন্তু আজ মনে হয় বড় জোর দশ সেকেন্ড!

আচমকা যেন রিয়ান বুঝতে পেরেছিল কী হয়েছে। ও চট করে আমায় নামিয়ে দিয়েছিল মাটিতে। আমি তখনও ওর পিঠের কাছের জামাটাকে খামচে ধরে ছিলাম। ও আলতো করে ছাড়িয়ে দিয়েছিল আমার হাত।

আমি তাকিয়েছিলাম ওর চোখের দিকে। কিন্তু রিয়ান কিছুতেই আমার দিকে তাকাচ্ছিল না। আমি হাত দিয়ে ওর থুতনিটা ধরে আমার দিকে ফেরাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু রিয়ান ঘাড় শক্ত করে সরে গিয়েছিল দ্রুত।

আমি বলেছিলাম, "সরে যাচ্ছিস কেন?"

রিয়ান সময় নিয়েছিল কিছুটা। তারপর বলেছিল, "নাথিং হ্যাপেন্‌ড। জানবি কিন্তু হয়নি। জাস্ট অ্যাক্সিডেন্ট মনে করে ভুলে যাবি।"

আমি বলেছিলাম, "কেন? কেন ভুলে যাব?"

রিয়ান অধৈর্য হয়ে বলেছিল, "যা বলছি, শোন। এসব আমার জন্য নয়। আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আর দুর্বলতা নেই। তুই এসব মনে রাখবি না। তোর গোটা জীবন পড়ে আছে। এসব ফালতু সেন্টিমেন্ট নিয়ে পড়ে থাকবি না।"

"ফালতু সেন্টিমেন্ট!" আমার বুকের ভিতর জ্বালা করছিল খুব। মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছিল রিয়ানের চুল ধরে টেনে, কিল-চড় মেরে জামা ছিঁড়ে দিতে! কী বলছে ও! কী ফালতু? ও বোঝে না কিছু? কেন একটা মেয়ে সারা জীবন ওর চারপাশে ঘোরে? কেন বারবার আসে? কেন কোনও অবহেলাকেই অবহেলা মনে করে না!

রিয়ান বলেছিল, "মা বলছি, শোন! একদম ফালতু জেদ দেখাবি না। জীবনে অ্যাক্টিভেট হয়। এটাও তেমন। আর কিছু নয়। ডোন্ট মেক মাউন্টেন আউট অব আ মোল হিল।"

"তুই আমায় একটু..." আমার গলা ধরে এসেছিল হঠাৎ।

"রাজি," রিয়ান ধমক দিয়েছিল, "কন্ট্রোল ইয়োরসেলফ্! এসব নিয়ে পড়ে থাকিস না। আমার সময় নেই এসবের। আমার পড়া আছে। তুই এবার যা।"

আমি জলে ভেজা গলায় বলেছিলাম, "এভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছিস? আজ আমার জন্মদিন রিয়ান।"

রিয়ান আমার দিকে তাকিয়ে ছিল এক মুহূর্ত। তারপর নিজের ডেস্কের থেকে একটা চামড়া বাঁধানো খাতা তুলে বলেছিল, "এই খাতাটা তোর পছন্দ না? এটা তুই রাখ। বার্থডে গিফ্ট।"

আমি বলেছিলাম, "লাগবে না। গিফ্ট আমি পেয়ে গিয়েছি।"

রিয়ান জোর করে আমার হাতে খাতাটা গুঁজে দিয়ে বলেছিল, "কিচ্ছু পাসনি। বলেছি না কিছু হয়নি। তোর ভ্রম ওটা। আমার ভুল। এটা রাখ। হ্যাপি বার্থডে।"

আজও আমার ঠোঁটে লেগে রয়েছে সেই শেষ বিকেলের আলোটুকু। আজও মনের ভিতর রয়ে গিয়েছে সেই গন্ধের স্মৃতি। আমার একাকী সময়ে আজও ওই বিকেলটুকুই সম্বল আমার!

সেদিন লিফটের সামনে সেই যে আচমকা আকাশ আমায় জড়িয়ে ধরেছিল। ঠোঁটে ঠোঁট রেখেছিল। আমার কিন্তু তাতে কিছুই মনে হয়নি। আমার শুধু রিয়ানের মুখটা মনে পড়ছিল। সেই সার-সার ছবির ফ্রেমের মাঝে আমি যেন রিয়ানকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। রাগী, গম্ভীর আর বিরক্ত মুখের রিয়ানকে।

কতক্ষণ আকাশ আমায় ধরেছিল আমি জানি না। কিন্তু আমায় থেকে সরে গিয়ে ও কিছুটা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে। বলেছিল, "তুমি রেগে গেছ?"

আমি মাথা নেড়ে বলেছিলাম, "না।"

"তা হলে?" আকাশ এক পৃথিবী জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে।

আমি বলেছিলাম, "কী তা হলে?"

"তা হলে এমন স্টিফ হয়ে ছিলে কেন? আমার মনে হচ্ছিল আয়াম কিসিং আ পোল!"

আমি কিছু না বলে মাথা নামিয়ে নিয়েছিলাম।

আকাশ আলতো করে আমার হাত ধরেছিল। বলেছিল, "আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টেক অ্যাডভান্টেজ। ডোন্ট ওয়ান্ট টু হার্ট ইউ। আই লাইক ইউ আ লট। আই থিঙ্ক আয়াম ফলিং ফর ইউ। তাই আজ নিজেকে আটকাতে পারিনি। ইউ স্মেল সো নাইস।"

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। আকাশ তো ভাল কথাই বলছিল। প্রশংসাই করছিল। কিন্তু আমি কিছুতেই খুশি হতে পারছিলাম না। আমি ভাইছিলাম যে, কথাগুলো আমার মধ্যে ভাল কিছু অনুভূতি তৈরি করুক। আমায় আনন্দ দিক। কিন্তু কিচ্ছু আসছিল না। বরং কেমন একটা ক্লান্তি আসছিল। মনে হচ্ছিল এই আকাশকে আমায় বিয়ে করতে হবে? এই ছেলেটার সঙ্গে আমায় গোটা জীবন কাটাতে হবে? এখনও এর বাড়িতে ঢুকিনি কিন্তু এখনই এমন ক্লান্ত হয়ে পড়ছি? আমার মনে হচ্ছিল অদৃশ্য এক শেকল যেন বেঁধে ফেলছিল আমায়!

কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে আমার তো এমন মনে করার কথা নয়! এত ভাল ছেলে! ভাল চাকরি! ব্যবহার ভাল! দায়িত্ববান! দেখতে সুন্দর! কথা বলে ভাল! তার উপর বাড়ির সবাই রাজি! এমন ছেলেকে বিয়ে করলে তো জীবনে আর চিন্তাই থাকবে না। তা হলে? তা হলে আমার অমন হচ্ছিল কেন? কেন বারবার মনে হচ্ছিল দৌড়ে পালিয়ে যাই দমদম এয়ারপোর্ট! সপাটে বলে দিই আকাশকে যে 'তুমি ভাই কাটো। সামনের ফ্লাইফোঁটার আগে এসো না!'

সেদিন আকাশদের বাড়িতে বিকেল অবধি ছিলাম। ওর বাবা, মা সবার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল। মা তো সত্যিই খুব অসুস্থ। টানা কথাও বলতে পারছিলেন না। তাও আমায় পাশে বসিয়ে আমার হাত ধরে রেখেছিলেন।

ফরসা মানুষটা কেমন যেন ছোট কুণ্ডলী পাকিয়ে গিয়েছিল! অল্প আলোয় বুঝতে পারছিলাম মানুষটার আর বিশেষ জীবন অবশিষ্ট নেই। ফরসা, নীলচে মুখের ভিতর কেমন একটা অসহায়তা!

উনি আমার হাত ধরে বলেছিলেন, "তুমি মা আমার উপর রাগ করোনি তো?"

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

উনি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলেছিলেন, "আমার জন্যই তো তোমায় আসতে হল। আসলে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে এমন রীতি তো নেই! তোমার বাড়ির লোকজন ভাল বলতে হবে যে, তোমায় আসতে দিয়েছেন!"

আমি বলেছিলেন, "না, না, তাতে কী!"

উনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "ছেলেটা আমার পাগল! বিদেশে গিয়ে হুট করে না হলে কেউ বিয়ে করে নেয়! ওদের গায়ের রং, চোখের রং, মুখ-চোখ সুন্দর হতে পারে, কিন্তু শুধু সুন্দর দিয়ে তো জীবন কাটে না! এতসঙ্গে থাকতে হলে অন্যকে জায়গা দিতে হয়। অন্যের ভাল-মন্দটা দেখতে হয়, সেটার যত্ন করতে হয়। তোমায় দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। সুজাতাও খুব প্রশংসা করেছে। আকাশও খুব খুশি। ওর তো তোমায় একবার দেখেই ভাল লেগে গিয়েছিল। এখন তোমার যদি পছন্দ হয়, আমার ছেলেকে, তা হলে নিশ্চিন্ত হই।"

আমি কী বলব, বুঝতে পারছিলাম না। এরা এত ভাল মানুষ! কী করে এদের বারণ করব? আর সত্যি বলতে কী, বারণ করব কার জন্য? কে আসবে আমার কাছে? কার জন্য অপেক্ষা করব আমি? আমার তো নিজের জীবনের দিকেও তাকানো উচিত! তবে? তবে কেন আমার মনের ভিতর লাল পিঁপড়েরা জড়ো হচ্ছিল?

আকাশের বাবা খুব ভাল গান করেন। সেদিন উনি বেশ কয়েকটা গান শুনিয়েছিলেন। আকাশ ছোট্ট একটা পিয়ানো বাজাচ্ছিল গানের সঙ্গে। বাইরে থেকে ওদের ভীষণ সুন্দর করে সাজানো বসার ঘরে আলো এসে পড়ছিল। সবটাই যে কী সুন্দর লাগছিল! মনে হচ্ছিল এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে!

কিন্তু আমার মধ্যের সত্যিকারের আমিটা কিছুতেই যেন এসব যুক্তি আর বুদ্ধি মানতে চাইছিল না। মনে হচ্ছিল সব কিছু ঘেঁটে দিয়ে চলে যাই।

সেদিন আকাশ আমায় নিজের গাড়ি করে বাড়ি অবধি ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই উপরে আসেনি। শুধু যাওয়ার আগে বলেছিল, "প্লিজ্ আমায় ফিরিয়ো না।"

আমি কিছু বলতে পারিনি। শুধু দরজা দিয়ে ঢোকার মুখে চারদিকের বাড়ির মাঝে কোনওমতে টিকে থাকা শেষ বিকেলের আকাশ দেখছিলাম। একটা তারা জ্বলজ্বল করছিল। মনে হয়েছিল, রিয়ান তোর ওখানের আকাশটাও যেন সুন্দর থাকে!

"কী রে, কী করছিস তখন থেকে? তোর বাবা তোকে খুঁজছিল।"

আমি দরজার দিকে তাকালাম। মা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

মা বলল, "সকালে পড়িয়ে এসেই এসব নিয়ে পড়েছিস! এইসব জিনিসগুলোকে এক জায়গায় করেছিস কেন?"

আমি বললাম, "চিলেকোঠায় রেখে দেব মা।"

মা ঘরের ভিতর এসে জিনিসগুলো দেখল। বই, পেন, কিছু নোটস্, পুতুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"রিয়ান দিয়েছিল না?" মা তাকাল আমার দিকে।

আমি কিছু না বলে আবার টেব্‌লের দিকে ফিরে কিছু কাজ করছি এমন ভান করলাম।

মা বলল, "ঠিক করছিস। আমি বলি কী, এসব চিলেকোঠাতে রেখেই বা কী করবি? বিক্রি করে দিই বরং!"

"না," আমি তাকালাম মায়ের দিকে, "চিলেকোঠাতেই থাকবে।"

মা বসল আমার বিছানায়। গায়ের চাদরটা টেনে বলল, "সত্যি মানুষ চেনা যায় না! ওইটুকু বয়স থেকে রিয়ানকে দেখছি। কিন্তু আমরা কি বুঝেছিলাম এমন ছেলে ও? তোর জেঠিমা ঠিক বলেছে।"

আমি অবাক হলাম, "জেঠিমা আবার কী বলল?"

"বলেছে, আর যদি ও কোনও দিন এবাড়ির ত্রিসীমানায় আসে তো ওর বাপের বিয়ে দেখিয়ে ছাড়বে! আর জানিস তো, তোর জেঠিমা যা বলে সেটাই করে!" মা বলল, "রিয়ান এমন, ভাবতে পারিনি। আজ ওর মাকে ফোন করেছিলাম। রিয়ান নিজের মাকেও নাকি ফোন করে না! সময়ই নাকি পায় না! তা কী রাজকার্য করছে কে জানে! দেখ, কোন মেমের পাল্লায় পড়েছে!"

আমি তাকালাম মায়ের দিকে। রিয়ানের সম্বন্ধে এসব কী বলছে মা! কেনই বা বলছে!

মা তাকাল আমার দিকে, "তুই বড্ড ভাল আর বোকা। শোন, ওর কথা বাদ দে। আকাশ কত ভাল ছেলে বল তো! কত খবর নেয়। ও! ভাল কথা, ওঁরা আসছেন।"

"কারা?" আমি ঘাবড়ে গেলাম।

"আকাশরা। আকাশ, আকাশের বাবা আর আকাশের মাসি। তেরো তারিখ। রবিবার। সন্ধেবেলা।"

"কেন?" আমি অবাক হলাম।

"আঃ! বিয়ের তারিখ ঠিক করতে হবে না?" মা বিরক্ত হল, "আমি তোর বাবাকে বলেছি, এই অবস্থায় কী করে বিয়ে দেব? ওদের কত ভাল অবস্থা! আর আমাদের কী দশা হয়েছে! তোর জেঠুর হাতে তোলা হয়ে থাকতে হচ্ছে!"

আমি চেয়ার টেনে বসলাম। তারপর টেব্‌লের উপর বাকি বইপত্তরগুলো গোছাতে-গোছাতে বললাম, "এখনই কী বিয়ে? আমি জানি না তো!"

মা বিছানায় রাখা জিনিসগুলোকে সাজিয়ে রাখতে-রাখতে বলল, "তোকে জানতে হবে না। একদম বাপের মতো হয়েছিস! আর শোন রাজি, ওসব রিয়ান-ফিয়ানের কথা ভুলে যা একদম।"

শেষ কথাটার আকস্মিকতায় আমার হাত থেকে বইগুলো পড়ে গেল!

মা তাকাল আমার দিকে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের থেকে পড়ে যাওয়া চাদরটা ঠিক করতে-করতে বলল, "আমি বোকা নই। তোর বাবা বলছিল, এই বিয়েতে নাকি তোর মত নেই। আমি ওসব কিছু বরদাস্ত করব না রাজি। এমন ছেলে হাতছাড়া করব না। তোর জীবনে এমন বিশাল কিছু তুই করছিস না। আর চাকরি পেলে বিয়ের পরও করতে পারবি। তোরা বাপ-বেটিতে মিলে কিছু যদি পণ্ড করতে চেয়েছিস তো বেঘিস কী করি!"

আমি চোয়াল শক্ত করে বসে রইলাম। আমায় কেউ একবার জিজ্ঞেসও করল না আমি কী চাই! ওদের বাড়ি থেকে আসার পর আমায় হাজারটা প্রশ্ন করেছে মা আর জেঠিমা। কী খেয়েছি! ওদের বাড়িটা কেমন! বাবা-মা কেমন! বাড়ির দেওয়ালের রং কী! পরদার রং কী! মা কী বললেন! বাবা কেমন গান গাইলেন! আরও কত কী! কিন্তু আসলে যে প্রশ্নটা করা উচিত ছিল সেটা কেউ করেনি। আজ পর্যন্ত কেউ করেনি!

মা বলল, "নিচে যা একবার। জেঠিমা ডাকছে তোকে। আর যা বললাম, মনে রাখবি। তেরো তারিখ সন্ধেবেলা কোনও কাজ রাখবি না। বুঝলি?"

মা চলে যাওয়ার পর আমার বুকের ভিতর কেমন একটা করল যেন! তেরো তারিখ! আমি এখন জানলাম! তার মানে সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে! আমার জীবনকে একটা পরিণতির দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে? এবার আমি কী করব? রিয়ানকে তো ফোন করেছিলাম! ধরেনি। মেল করেছিলাম। উত্তর দেয়নি! এখন কী হবে? তবে কি আমি ঠিক করছি? আমার স্মৃতিগুলোকেও কি তবে এইসব জিনিসের সঙ্গে চিলেকোঠায়

রাজিতা আর আমি কাঠের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কীভাবে আকাশ থেকে কটন ক্যান্ডির মতো তুষার নামছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখে দেব?

আমি জানি জেঠিমার ডাক মানে সঙ্গে-সঙ্গে যেতে হবে।

বারান্দায় বেরিয়ে আমি সামনের দিকে তাকালাম। আজ ঠাকুরমার বারান্দা ফাঁকা। শুধু কুকি দেখলাম বারান্দার দিকের ওই সাঁকোটার মুখটায় একটা বাঁশের গেট শক্ত করে বাঁধছে।

আমি অবাক হলাম। এই সাঁকোটা আর ব্যবহার করা হয় না। মাঝে-মাঝে ভেঙেও গিয়েছে। কেউ আর যায় না। কথা হয়েছিল একবার দু'দিকেই দেওয়াল গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হবে। কিন্তু আর হয়নি। এমনিই পড়ে আছে। তবে আজ হঠাৎ সাঁকোর মুখটায় অমন বাঁশের বেড়া দিচ্ছে কেন?

আমি একটু জোরে ডাকলাম, "কুকিদি, কী করছ গো? ঠাকুরমা কই?"

কুকি মুখ তুলে তাকাল। তারপর হাতের কাজটা থামিয়ে বলল, "ওই ঘরে আছে। বাচ্চাগুলো এসেছে। আজকাল ঠাকুরমার কাছেই পড়ে থাকে। খালি গল্প আর গল্প! ঠাকুরমাও পারে বটে! এই বয়সেও কত বকতে পারে!"

আমি হাসলাম। এটা ভাল হয়েছে। একা-একা বসে থাকত ঠাকুরমা! দেখে কী খারাপ লাগত! এই শেষ বয়সটায় মানুষ এত একা হয়ে যায়! যে আগে সবটা সামলাত তাকে কী করে ভুলে যায় সবাই! কাঁকবারিতা ছাড়া কি মানুষের নিজের কোনও মূল্য নেই! আমরা সবাই কি আসলে রেসের ঘোড়া?

বললাম, "কিন্তু তুমি এটা কী করছ?"

কুকি বিরক্ত হয়েছে। এমন গলায় বলল, "আর বোলো না! ঠাকুরমা বলল এই সাঁকোর মুখটা যেন বাঁশের বেড়া দিয়ে বেঁধে দিই। বাচ্চাগুলো আসে তো! কখনও যদি সাঁকোতে উঠে পড়ে! সাঁকোটার যা অবস্থা! ভেঙে পড়তে পারে! তখন তো একটা কেলেঙ্কারি হবে! তাই এইটা বানিয়ে নিয়ে এসেছি।"

আমি ভাবলাম ভালই হয়েছে। সত্যি সাঁকোটার অবস্থা বিপজ্জনক। আমাদের বারান্দার দিকটায় সাঁকোর মুখে একটা পুরনো ভাঙা চেয়ার রাখা আছে। এদিকটাও গেঁথে দিলে হয়।

কুকি বলল, "তোমার নাকি বিয়ে?"

আমি চমকে গেলাম। এসব কী কথা! কে বলল এসব!

"আমার কানে এসেছে! তোমার জেঠিমা ফোন করেছিল ঠাকুরমাকে। আমি ঘর মুছছিলাম। ঠাকুরমার কথা শুনে আঁচ করলাম। ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করলে তো আর বলবে না! তাই ঘোড়ার মুখের থেকেই জানতে চাইছি। সত্যি গো?" কুকি বারান্দার রেলিংয়ের উপর ঝুঁকে পড়ে তাকাল আমার দিকে। ভঙ্গিটা দেখে মনে হল উপায় থাকলে বোধ হয় ওই সাঁকো বেয়ে চলে আসত!

আমি বললাম, "হাইনাল কিছু নয়। কথা হচ্ছে। যেমন হয়।"

কুকির যেন উত্তরটা পছন্দ হল না। আবার ওই গেটের দিকে মন দিল। তারপর বলল, "দেরি কোরো না আবার। এমন রূপ দিয়েছে ভগবান! সময় থাকতে কাজ গুছিয়ে নিয়ো!"

আমার কান গরম হয়ে গেল! কুকি হয়তো পড়াশোনা জানে না ভাল। তাই কথাটা এমন করে বলে দিল। কিন্তু আমি অনেক শিক্ষিত মানুষকেও দেখেছি এমন কথাটাই ঘুরিয়ে, সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে! রূপ ব্যাপারটা যেন খুব দরকারি! মাল্টিন্যাশনাল কনগ্লোমারেট থেকে বাড়ির পিসিমা, ছোটমামা সবার কাছে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেন কিছু নেই! রাস্তায় বেরোলেও বুঝতে পারি ব্যাপারটা। অল্পবয়সি থেকে বৃদ্ধ। সবার চোখের ভিতর যেন জিভ আছে! বাসে কত অসভ্যতা যে সামলাতে হয়! অচেনা বসলে পাশের লোকটার কনুই, আয়না দিয়ে আসা চালকের দৃষ্টি, কত কিছু যে কাটতে হয়! এত কষ্ট লাগে মাঝে-মাঝে! শিক্ষার প্রধান অংশ যে, মেয়েদের মাংসের তাল হিসেবে না-দেখা, সেটা কেউ বোঝে না!

জেঠিমা বসেছিল বারান্দায়। কমলালেবু ছাড়িয়ে জড়ো করছিল পাশে। আমায় দেখে হাসল। বলল, "মোড়াটা টেনে বোস তো। কথা আছে তোর সঙ্গে।"

টায়ার দিয়ে বাঁধানো প্লাস্টিকের সুতো লাগানো মোড়া। আমি টেনে বসলাম।

জেঠিমা আমার মুখে একটা কমলালেবু গুঁজে দিয়ে বলল, "তোর জন্য ঘরে কিছু জিনিস কিনে এনেছি। বিউটি প্রোডাক্ট। টিভিতে দেখায়। তোর জেঠুকে পরশু বলেছিলাম। গতকাল কিনে এনেছে। মাখবি। ফরসা হওয়া যায়। আর সানস্ক্রিনও আছে।"

আমি বললাম, "আমি তো মোটামুটি ফরসা জেঠিমা।"

জেঠিমা সামনের বড় জামবাটি ভর্তি কমলালেবু পাশে সরিয়ে খোসাগুলোকে খবর কাগজ দিয়ে মোড়াল, তারপর বলল, "তুই অনেক ফরসা ছিলি। কিন্তু রোদে বেরিয়ে-বেরিয়ে কী হাড়গিলে হয়েছিস! দেখ, আমার মায়ের পাল্লায় পড়লে তোকে রোজ মুলতানি মাটি, চন্দন, ডালবাঁস, সরবাঁস আরও কত কী মাখাত জানিস? বিয়ের আগে মা আমায় পুরো চার মাস প্রায় গ্লাসটার করে রাখত এসব দিয়ে।"

আমি কিছু বললাম না। বুঝতে পারছি কথা কোন দিকে এগোচ্ছে!

জেঠিমা বলল, "যে ক'দিন বাকি আছে ওসব মাখবি। আর হ্যাঁ, একটা কথা। তোর একটা চিঠি এসেছে। একটু আগে।"

"চিঠি?" আমি চমকে গেলাম, "এতক্ষণ বলোনি!"

জেঠিমা বলল, "এতক্ষণ বলিনি মানে? যেটা বেশি দরকার সেটা বলব না? ওসব চিঠি-ফাপাটি সারা জীবন আসবে। তাতে কী!"

আমি জানি তর্ক করা বৃথা। মোড়া থেকে উঠে ঘরের ভিতর ঢুকলাম। সামনেই জেঠুর টেবল। তার উপরেই রাখা আছে চিঠিটা। ব্রাউন, মোটা খাম। আমি তুললাম। আর সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভিতর বাবুই পাখি ঝাপটে উঠল! স্কুলের মোনোগ্রাম করা খাম! এখানেই তো ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম!

আমি কত হাতে খামটা খুললাম। আমার হাত কাঁপছে। গলা শুকনো। কলকাতার ভিতরেই স্কুল। খুব বড় নয়। কিন্তু আবার একদম ছোটও কিছু নয়। সেখানে ইকোনমিক্স পড়ানোর জন্য আমায় বাছা হয়েছে! আমায় ডাক পাঠিয়েছে স্কুল থেকে। এটা আমার নতুন চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার!

আমি কত বারান্দায় এলাম। বসে থাকা জেঠিমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলাম দু'হাতে। আমি কাঁপছি, কান গরম হয়ে গিয়েছে! চোখে জল আসছে আবার!

জেঠিমা বলল, "আরে, কী হল?"

"জেঠিমা!" আমি কাঁপা গলায় চিৎকার করে বললাম, "আমি চাকরি পেয়েছি! স্কুলে! জানুয়ারিতে জয়েনিং!"

"তাই!" জেঠিমা আমায় হাত ধরে ঘুরিয়ে সামনে আনল। জেঠিমার ফরসা মুখটাও ঝলমল করছে, "দারুণ খবর! এটা তো হতই!"

আমি বললাম, "ব্যস, আর কিছু চাই না!"

জেঠিমা বলল, "ভালই হল! বিয়ে, চাকরি একসঙ্গে! খুব ভাল!"

আমি বললাম, "বিয়ে!"

জেঠিমা তাকাল আমার দিকে বলল, "তবে না তো কী? ওটাই আসল। বিয়ের পর চাকরি করবি! এটা সেকেন্ড বেস্ট খবর!"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

জেঠিমা বলল, "তোর যা গুণজ্ঞান! চাকরি পেয়েছিস ভাল কথা, কিন্তু আসল ব্যাপারটা ভুললে চলবে না। শোন, একবার রিয়ানের ব্যাপারে গুবলেট করেছিস। আর করবি না। সামনেই তোর বিয়ে। আমি নিজে দাঁড়িয়ে দেখ! মনে থাকে যেন!"

শেষের দিন রিয়ানও আমায় এমন একটা কথা মনে রাখতে বলেছিল।

ও আমায় বলেছিল, "আমি তোর কেউ নই। তুইও আমার কেউ নোস। যা ভুলে যেতে বলেছিলাম, ভুলে যাসনি, সেটা তোর প্রবলেম, আমার নয়। কোনও আশা রাখিস না। আমার আর তোর গল্প এখানেই শেষ। মনে থাকে যেন!"

AMARBOI.COM

আমার মনে থাকে। আমার সব মনে থাকে। স্মৃতি আমার শত্রু! আমি কিছুই ভুলতে পারি না। আমার ছোটবেলার সেই দুয়ারপাত, সেই জন্মদিনের বিকেলের আবছা ঘর বা বেজে-বেজে কেটে যাওয়া ফোন। কোনও কিছুই ভুলতে পারি না আমি। কিন্তু এখন আমায় ভুলতে হবে। সব কিছু মুছে ফেলতে হবে। ওই আমার ঘরে জড়ো করা জিনিসের মতো সব কিছু লুকিয়ে ফেলতে হবে কোনও এক গোপন চিলেকোঠায়। আর তার চাবিটা ফেলে দিতে হবে দূরের সেই আকাশগঙ্গায়!

আমি সিঁড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। একতলা থেকে দোতলার দূরত্ব আজ হঠাৎ সেই আকাশগঙ্গা পেরনোর মতো মনে হল আমার! এক হাতে চাকরির চিঠি, অন্য হাতে ফ্রিমের প্যাকেট! আমার যদি দস্যু মোহনের মতো তৃতীয় একটা হাত থাকত! তা হলে? সেই হাত দিয়ে কাকে ধরতাম আমি? এই আকাশগঙ্গা পেরিয়ে কার কাছে পৌঁছতে চাইতাম আমি! আমার জীবনের সবচেয়ে ভাল খবরটা নিয়ে কার কাছে পৌঁছতে চাই আজ?

হে দোয়েল পাখি, তোমরা কোথায়? তোমরা কেন আজ সবাই মিলে ডানায় ডানা বেঁধে আমার জন্য সাঁকো তৈরি করছ না? কেন পার করতে দিচ্ছ না এই অসীম মিষ্টি ওয়ে! কেন এপারে বেঁধে রাখতে চাইছ আমায়! কেন আজ আমার জন্যও সাঁকো বানিয়ে দিচ্ছ না? আমাদের মধ্যের জং-ধরা, পুরনো সাঁকোগুলো কি তবে ভেঙেই যাবে! সেসব কি শুধু নানা দিক থেকে বন্ধই করে দেওয়া হবে? কেউ কি নেই সে সব আবার খুলে দেওয়ার জন্য? ও দোয়েল পাখি, তোমরা কই? রূপকথা ছেড়ে একবারও কি আসবে না আমার জন্য? শুধু কি গল্পই শুনে যাব চিরকাল? কোনওদিন কি আমার জীবন গল্পের মতো হয়ে উঠবে না!

চোদ্দো

রিয়ান

আজ বরফ পড়ছে চারদিকে। সারা শহরের উপর ছ্যানিলা আইসক্রিমের মতো বরফ জমে আছে। আমি তার উপরেই পায়ের ছাপ দেখলাম। সামনে দিগন্ত দিকে চলে গিয়েছে সেই চিহ্ন! আশপাশে কেউ নেই! শুধু আমি একা! জানি ওই পথেই বাবা চলে গিয়েছে! আমায় এখানে রেখে গিয়েছে একা!

আমি চারদিকে তাকালাম! ওই তো শহিদ মিনার দেখা যাচ্ছে। ভিক্টোরিয়ার পরি দেখা যাচ্ছে! দেখা যাচ্ছে নেতাজির মূর্তি! কিন্তু মানুষজন কেউ নেই! শুধু একজোড়া পায়ের চিহ্ন পড়ে রয়েছে কেবল!

আমার ভয় লাগছে! আকাশের দিকে তাকালাম আমি। বড়-বড় গ্যাস বেলুন উড়ছে চারদিকে! বেগুনি রঙের একটা আলো ছড়িয়ে আছে। আর আওয়াজ হচ্ছে! একটানা হাতুড়ি পেটার মতো শব্দ হচ্ছে কোথাও।

আমার বুকের ভিতর কষ্ট হচ্ছে একটা! মনে হচ্ছে টন টন বরফের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে আমার বাড়ি! আমি আর ফিরতে পারব না সেখানে! শুধু সাদা জীবন অদ্ভুত আত্মার মতো ঘুরতে হবে আমায়!

আমি পায়ের চিহ্ন ধরে দৌড়তে শুরু করলাম! আকাশে বেলুন বাড়ছে আরও! বেগুনি রং গলে-গলে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে বরফের মতো। আমি সেই সব ছাড়িয়ে দৌড়তে লাগলাম। আমায় পৌঁছতে হবে! বাবার কাছে পৌঁছতে হবে!

তারপর পথটা কেমন যেন ঢালু হয়ে এল! আর কী অবাক! পথের পাশে ছোট-ছোট বাড়ি! তাদের দেওয়ালে ঘাস জন্মে গিয়েছে! এসব কার বাড়ি? কারা থাকে এখানে! সামুদা থাকে? ওই তো সামুদা দাঁড়িয়ে রয়েছে জানালায়। আমি 'সামুদা' বলে চিৎকার করলাম! কিন্তু সামুদা শুনতেই পেল না। আমি পাশের বাড়িটা দেখলাম। ওই তো! ওর সামনেই গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে পায়ের ছাপ।

আমি দৌড়ে গেলাম সেদিকে। এই তো জুতো! বাবার জুতো! আমি দ্রুত দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। কিন্তু ঘর কী দেখব! চারদিকে তো গ্যাস বেলুন! সারা ঘরে বেগুনি উড়ছে! আমি সেইসব বেলুন সরিয়ে এগোতে লাগলাম। হাতুড়ির শব্দটা বাড়ছে। মাথার ভিতর যন্ত্রণা হচ্ছে আমার! আমি বেলুনের ভিতর সাঁতার কাটার মতো করে এগিয়ে গেলাম সামনে। আর-একটা দরজা। বেগুনি রঙের! কী আছে ওপারে!

আমি আলতো হাতে ঠেললাম দরজাটা! শব্দ করে খুলে গেল কিছুটা। এগিয়ে গেলাম একটা। আর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থমকে গেলাম আমি। কে শুয়ে আছে বিছানায়? সাদা চাদর ঢাকা। আর ঘরের ছাদ থেকে কেন এমন বেগুনি রঙের তুষার ঝরে পড়ছে!

আমি দ্রুত এগিয়ে গেলাম! তারপর এক টানে চাদরটা সরিয়ে দিলাম! সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকে উঠলাম তুষার! সাদা তুষার-ঢাকা মুখ! আর আমুকাই চোখ খুলে তাকাল বাবা! নীল চোখের মণি! আমি আতঙ্কে পিছিয়ে আসতে গেলাম কিন্তু পারলাম না! বাবা বরফের মতো একটা ঠান্ডা হাত দিয়ে ধরল আমার হাত! আর আমার সারা শরীর জমে গেল নিমেষে! মাথা ঘুরে গেল! আমি চোখ বন্ধ করে মাটিতে পড়ে যাচ্ছি যেন! শুধু চোখ বন্ধ করার আগের মুহূর্তে দেখলাম একটা হাত এসে ধরছে আমায়! খুব চেনা একটা হাত! দেখলাম আমায় ধরে রয়েছে রাজিতা!

"স্যার, স্যার!"

আমি মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। গাড়ির ড্রাইভার ভদ্রলোক তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। শিয়ালদা ফ্লাইওভারে আটকে আছে গাড়ি!

আসলে প্লেনে আসার সময় ঘুমের মধ্যে দেখা স্বপ্নটা বারবার মাথার ভিতর ঘুরছে! পাক মারছে! কেন দেখলাম স্বপ্নটা? কী মানে এর? হঠাৎ দেখলাম কেন! তাই অন্যমনস্ক হয়েছিলাম!

"স্যার, সামনে থেকে লেফট টার্ন নিচ্ছি! অসুবিধে নেই তো!"

ড্রাইভারটি তাকাল আমার দিকে!

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না! অসুবিধে ব্যাপারটা আর আমায় মাথায় ঢুকছে না! আমি এতটা পথ এসেছি যে-কারণে সেটার সামনে আর কোনও অসুবিধেই তো অসুবিধে নয়!

সেদিন সামুদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না! রাজিতার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে! মানে রাজিতা এবার থেকে অন্য একজনের হয়ে যাবে! বাকি জীবনটা! কিন্তু সে কী করে সম্ভব! ছোট থেকে তো ও আর কারও কিছে তাকায়নি! তবে!

আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করব! ওকে ফোন করব একটা! কিন্তু কী বলব! আমি যে কথা বলে এসেছি সেটা কী করে ফেরাব! ও যে ইমেল করেছে, উত্তর দেইনি! ফোন করেছে, ধরিনি! রজতকাকুর অসুস্থতার খবর নিইনি! এসবের কী উত্তর দেব আমি!

আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না! পরীক্ষা চলছিল! কিন্তু কী পড়ছিলাম জানি না! কেবলই রাজির মুখটা মনে পড়ছিল! অমন বড়-বড় চোখ, গালের টোল, সব মনে পড়ছিল! বুকের ভিতর কষ্ট হচ্ছিল আমার! বছদিন আগের সেই শেষ বিকেলের আধো আলোর ঘরটায় ফিরে যেতে চাইছিলাম! শুধু মনে করার চেষ্টা করছিলাম, জীবনের কোন বিন্দু থেকে আমার ভুলের শুরু হল! কেন আমি রাজিকে এতটা 'টেকেন ফর গ্রান্টেড' করে নিলাম! আর এখন আমি কী করব! কী করা উচিত আমার!

সামুদা শুধু বলেছিল, "এবার তুই বুঝবি মানুষ হারানো কাকে বলে!"

আমি জানি মানুষ হারানো কাকে বলে! চোদ্দো বছর বয়সে যাঁকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালবেসেছিলাম, সেই বাবাকেই আমি হারিয়েছি! এখনও ঘুমে-জাগরণে সেই দৃশ্য বারবার আমার বুকের ভিতর ঢেপে বসে!

বাবা সেল্স-এ ছিল! কত জায়গায় যে যেত সেল্স কলে! সেবারও অফিসের কাজেই অসম যাবে বলেছিল বাবা। আমরাও জানতাম অসম গিয়েছে! কিন্তু একদিন সকালবেলার একটা কলিংবেলই সব পালটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিল!

আমি ক্লাস এইটে পড়ি তখন। আগস্ট মাস! টার্মিনাল এগজ্যাম চলছিল স্কুলের। সেদিন ভূগোল পরীক্ষা ছিল। আমি সকাল-সকাল উঠে একটু বই খুলে দেখে নিচ্ছিলাম। আর ঠিক তখনই কলিং বেলটা বেজেছিল!

মা স্নান করে সেই সময়টা ঠাকুরকে পুজো দেয় আমি জানতাম। তাই আমি নিজেই উঠে গিয়েছিলাম দরজা খুলতে।

ছোট পিপ-হোল দিয়ে উঁকি দিয়ে চমকে উঠেছিলাম খুব। পুলিশ! নিমেষে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। দরজা খুলে আমি চিৎকার করে মাকে ডেকেছিলাম!

এক-একটা মুহূর্ত আর ঘটনা থাকে যা জীবনকে পালটে দেয় পুরো! সেই সকালবেলাটা যেমন আমার জীবনকে পালটে দিয়েছিল!

পুলিশের সাব ইন্সপেক্টরটি যা বলেছিল শুনে মা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি! প্রায় এক রকম বসেই পড়েছিল মাটিতে!

আমতলার একটি হোটেলে বাবাকে পাওয়া গিয়েছে! এখনও গেলে নাকি আমরা দেখতে পাব! আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না।

পুলিশ ভদ্রলোকটি বলেছিল, "আমরা আপনাদের নিয়ে যাব। আমাদের এখানে খবর এসেছে। তাই আপনাদের জানাতে আর নিতে এলাম! ম্যাডাম, আমরা চাই আপনি একবার স্পটে শনাক্ত করুন বডি!"

মা তাকিয়েছিল আমার দিকে। কী বলবে বুঝতে পারছিলাম না! বাবাকে আমতলার হোটেলে পাওয়া গিয়েছে! কী করে? সেখানে কী করছিল বাবা? আচ্ছা, আমতলা জায়গাটা কোথায়? অসমে বলে তো মনে হয় না!

মা বলেছিল, "সামুকে একটু বলবি, আমাদের সঙ্গে যেতে? আমার শরীর খারাপ লাগছে!"

সাব ইন্সপেক্টরটির স্বর অল্প ছিল। আমাদের অবস্থা দেখে সে নিজেও খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিল। তাও ধীরে-ধীরে বলেছিল পুরো ব্যাপারটা!

বাবাকে পাওয়া গিয়েছিল খুবই বাজে অবস্থায়। সঙ্গে একটি মেয়েকেও পাওয়া গিয়েছে! সে কল-গার্ল! দু'জনকেই মেরে ফেলা হয়েছিল। গলা কেটে খুন করা হয়েছিল। বাবা আরও দু'জন লোকের সঙ্গে ওই মহিলাকিে নিয়ে রাতে আমতলার ওই হোটেলে উঠেছিল। তারপর কী হয়েছে কেউ জানে না। শুধু সকালে বাবা আর ওই মহিলাকে পাওয়া গিয়েছে গলার নলি-কাটা অবস্থায়! বাকি দু'জন নিরুদ্দেশ!

সাব-ইন্সপেক্টরটি বলেছিল, এমন নাকি বাবা আগেও বহুবার গিয়েছে। হোটেলের ম্যানেজার লোকটি বাবাকে চিনত। প্রতিবারই নতুন-নতুন মহিলা নিয়ে যেত বাবা!

গাড়ি পার করছিল তারাতলা মোড়, বেহালা ম্যান্সন, বেহালা চৌরাস্তা! চোখে-মুখে জিপের জানালা দিয়ে আসা হাওয়ার ঝাপটা লাগছিল! আমি তত দিনে অবস্থাটা বোঝার মতো বড় হয়েছিলাম! লজ্জায় মায়ের দিকে তাকাতে পারছিলাম না! সামুদা পাশে বসে আমার হাতদুটো ধরে রেখেছিল শক্ত করে। আমি শ্বাস নিতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম না যা শুনছি তা সত্যি কী না! বাবা বলত, স্বপ্নের মতো হবে আমার জীবন! কিন্তু দুঃস্বপ্নও যে স্বপ্ন, সেটা বলে দেইনি! আমি সেই চোদ্দো বছর বয়সে বুঝেছিলাম ব্যাপারটা।

ইন্সপেক্টরটি আরও নানান কথা বলছিল। কিন্তু আমি আর কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল শুধু! গলার কাছে ব্যথা করছিল খুব! শুধু মনে পড়ছিল ছোটবেলায় বাবার পাশে শুয়ে থাকার সেই শীতকালগুলো। মনে পড়ছিল নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ার আগে 'আমার বাবা' এই ভাবনাটার ওম! ভাবছিলাম, সবটাই কি তা হলে মিথ্যে ছিল!

হোটেলটা ছোট। কেমন যেন মেঘলা রঙের। আমরা জিপ থেকে নেমে দেখেছিলাম আরও কয়েকটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। মা এবার ভেঙে পড়েছিল একদম! সোজা মাটিতে বসে পড়েছিল! একজন মহিলা পুলিশ এসে মাকে ধরেছিল।

আর হাতুড়ির শব্দ হচ্ছিল! কাছেই কোথাও কিছু একটা ভাঙা হচ্ছিল! শব্দটা আমার মাথার ভিতরটাকে যেন ছিঁড়ে ফেলছিল হিংস্র কুকুরের মতো!

সামুদা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল, "নে, বড় হ এবার। চল!"

সরু বারান্দা পেরিয়ে একটা বেগুনি রঙের কাঠের দরজা। তার সামনে দু'জন পুলিশ দাঁড়িয়েছিল। আমাদের সঙ্গে ওখানের একজন ইন্সপেক্টরও ছিলেন।

দরজার কাছে দাঁড়ানো দু'জন পুলিশ আমাদের দেখে দরজা ছেড়ে দিয়েছিল। আমরা ঘরের ভিতর উঁকি দিয়েছিলাম।

বাবা শুয়েছিল। ঘরের ভিতর আরও দু'-তিনজন পুলিশের লোক কাজ করছিল। কিন্তু আমি আর কিছু দেখিনি। শুধু বাবার দিকে তাকিয়েছিলাম। সাদা চাদর ঢাকা! চোখ বন্ধ! আমার বুকের ভিতরটা আচমকা মুচড়ে উঠেছিল! মনে হচ্ছিল কেউ ড্রিল মেশিন চালিয়ে দিয়েছে বুকে! আমি শুনোর ভিতর একটা কিছু ধরার চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি! তারপর আর কিছু মনে নেই!

পরের সময়গুলোয় কী যে হয়েছিল আমার আজও সব স্পষ্ট মনে আছে! প্রতিটা সেকেন্ডের ভিতর রুবাতে থাকা সময়ের আরও ছোট-ছোট গলি-উপগলি আর চোরা পকেট, সব মনে আছে! মনে আছে প্রত্যেকটা মানুষের মুখ। তাদের কথা। আর কথার পেটে লুকিয়ে থাকা সেইসব না-বলা কথা! মনে আছে সেই সব রপরণে মজা পাওয়া মুখগুলো ঢেকে রাখার জন্য তৈরি সহানুভূতির মুখোশগুলোকে!

খবরের কাগজে বেশ কিছু দিন এই খবরটা নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া হয়েছিল। আমি আর মা চিড়িয়াখানার বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলাম। লোকে যেতে-আসতে আমাদের দিকে আঙুল তুলত! ফিসফিস করত! এখন মনে হয় ভাগ্যিস কেউ অটোগ্রাফ চেয়ে বসেনি!

আমরা ওই রজনী সেন রোডের বাড়ি ছেড়ে সেই সময়েই উঠে এসেছিলাম ভবানীপুরের মামার বাড়িতে! মামারা মাকে ভালবাসত খুব। কিন্তু যেহেতু মা বাবাকে নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করেছিল তাই মনে-মনে একটু আড় হয়েও থাকত!

মামার বাড়িতে ওঠার পর আমি দেখতাম মামারা এসে মাকে যখন-তখন যা খুশি তাই বলত! মা কিছু না বলে মাথা নিচু করে শুনত শুধু! তারপর একা-একা কাঁদত! আমি কতবার বলাম যাতে মা চুপ করে না শোনে। যেন কিছু বলে! কিন্তু মা বলত, "তোর বাপ যা করেছে আমায় তো শুনতেই হবে! সবার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করেছিলাম! এখন আর সংসার চলবে কী করে যদি দাদারা না টাকা দেয়! জানবি টাকার চেয়ে বড় শেকল আর কিছু হয় না!"

রাতে নিজের ঘরে শুয়ে ভাবতাম বাবা বেঁচে থাকতে যা শেখায়নি, মরে গিয়ে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে! তখন থেকেই কেবল মনে হত, এই শহরটা, এই সবার দৃষ্টি, মুখোশের তলায় লুকিয়ে থাকা বিনে পয়সার সার্কাস দেখা মুখগুলোর থেকে আমায় চলে যেতে হবে! আমি বুঝেছিলাম কেউ আমায় এ ব্যাপারে সাহায্য করবে না! যাকে সবচেয়ে ভরসা করেছিলাম সে-ই যখন এমন করতে পারে তখন বাকিরা তো আমায় নানাভাবে বিপর্যস্ত আর বিধ্বস্ত করবেই!

তাই আর কোনও দিকে তাকাইনি! রাজি যে সারাক্ষণ কাছে আসত! যত্ন করত! মামার দিকটা দেখত! সেটাও আমল দিইনি! আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম, কাউকে বঁধিত দেব না আমায়! আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম মাকে এই শহরটা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর কাজ নেই কোনও!

আর তারপরই 'ডালাস' ঘটল আমার সঙ্গে!

ব্রিজের থেকে বাঁ দিক নিয়েও আবার আটকে গেল গাড়িটা! আমি চোয়াল শক্ত করলাম। চারটে বাজে! পাঁচিশের মধ্যে পৌঁছতে পারব? রাজির মুখটা মনে পড়ল! কী করছে রাজি এখন? সাজছে! বুকের ভিতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোমরা ছল ফোটাল যেন! আমি বুঝতে পারলাম বিষের অণু-পরমাণু আমার শরীরকে আক্রমণ করছে! মনে হল আমার মাথাটা ফেটে যাবে! হিংসেয় আমি ভিতরে-ভিতরে মরে যাব!

আমি যেদিন চলে গিয়েছিলাম সেদিন সকাল থেকে আমাদের বাড়িতেই ছিল রাজি। গোছগাছ করে দেওয়া থেকে শুরু করে রান্না, সবটা শেষ পর্যন্ত করে গিয়েছিল। মা যদিও মুখে দেখাচ্ছিল না, তাও ভিতরে-ভিতরে কষ্ট হচ্ছিল তো, তাই কাজকম্ম কিছু করতে পারছিল না!

দুপুরে খেতে বসে মা বলেছিল, "রাজি, তুই আসা বন্ধ করে দিবি না তো!"

রাজি ডাল দিচ্ছিল হাতা দিয়ে। অবাক হয়ে তাকিয়ে বলেছিল, "কেন এমন বলছ?"

মা হেসে বলেছিল, "তুই জানিস কেন বলছি!"

রাজি আমমতা হেসে রাঙা হয়ে উঠেছিল! তারপর বলেছিল, "আমি তো আসবই!"

মায়ের চোখে জল চলে এসেছিল! ছোট্ট এক কুচি জল। মা কোনও মতে কষ্টটাকে ঢোক গিলে নিয়ে বলেছিল, "তবে না এলেই বা কী! আমি তো একাই থাকতে পারি!"

বিকেলের দিকে আমার ঘরে এসেছিল রাজি। আমি একটু চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলাম। রাজি পায়ে-পায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল আমার কাছে। তারপর আলতো করে বলেছিল, "তোর মনখারাপ করছে, না?"

আমি তাকিয়েছিলাম রাজির দিকে। তারপর মাথা নেড়ে বলেছিলাম, "সারা জীবন এটাই চেয়েছি। এই লক্ষ্যেই পড়াশোনা করেছি। মনখারাপ লাগবে কেন?"

রাজি ঠোঁট কামড়ে মাটির দিকে তাকিয়েছিল। যেন আটকাতে চাইছিল নিজেকে! তারপর কিছুটা সময় নিয়ে বলেছিল, "আমার খুব মনখারাপ করছে। আমি তোকে ছাড়া কী করে থাকব?"

আমি বিরক্ত হয়েছিলাম খুব। এসব কেন বলছে ও! জানে না এসব শোনা আমার বারণ! এত দিন তো আসে, ওই একদিন শেষ! কেউ ছাড়া আর কোনও দিন আমি ওর কাছে গিয়েছি! তবে আমাকে যাওয়ার সময় এসব কী শুরু করেছে?

রাজি ভেজা গলায় বলেছিল, "আমি জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই তো তোকে দেখছি। তোর কথা থেকে বড় হয়েছি! তুই চলে গেলে আমার কী হবে রিয়ান?"

আমি উঠে বসে বলেছিলাম, "এসব বন্ধ কর!"

রাজি তাকিয়েছিল সোজা! তারপর আচমকা আমার মুখটা দু'হাতে ধরে বলেছিল, "তুই এমন কেন? আমার তোকে বলার কিছু থাকতে পারে না? তোর-আমার মধ্যে কোনও দোয়েল-সাঁকো নেই?"

আমি ওর হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, "শোন, মিষ্টি ওয়ে একটা অ্যাক্টোনমিক্যাল ব্যাপার! কিছু মহাজাগতিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। ওটা নদী নয়। কোনও দোয়েল-পাখি তার উপর সাঁকো বানায় না! জীবনটা রূপকথা নয় রাজি!"

রাজিকে যেন কেউ পিঠে ছুরি মেরেছিল! ও আমার দিকে এমন করে তাকিয়েছিল যেন কী বললাম, বুঝতে পারছে না! শুধু বিহ্বল গলায় বলেছিল, "কী বললি তুই? এমনটা বলতে পারলি? আমার কি তোর উপর কোনও জোর নেই? আমি কি তোর কেউ নই?"

আমি চোয়াল শক্ত করে তাকিয়েছিলাম রাজির দিকে। স্পষ্ট গলায় কেটে-কেটে বলেছিলাম, "আমি তোর কেউ নই। তুইও আমার কেউ নোস! যা ভুলে যেতে বলেছিলাম, ভুলে যাসনি, সেটা তোর প্রবলেম, আমার নয়। কোনও আশা রাখিস না। আমার আর তোর গল্প এখানেই শেষ। মনে থাকে যেন!"

আসলে আমরা নিজেরাই অনেক সময় বুঝি না আমাদের জীবনে কে কোথায় বাঁধা রয়েছে! তাই আমরা তাকে অবহেলা করি! পাত্তা দিই না! ধরেই নিই যে সে তো থাকবেই! তার দিকে না তাকালেও চলে! কিন্তু তারপর সত্যি যখন একসময় সে ক্লান্ত হয়ে, আহত হয়ে সরে যায়, চলে যায়, তখন বুকের ভিতর অদৃশ্য সুতোয় টান পড়ে! তখন বোঝা যায় কার প্রাণ কোথায় বাঁধা!

শনিবার সামুদার কাছে গিয়েছিলাম আমি। সেখান থেকে ফেরার পথে আমার মাথা পুরো খারাপ হয়ে ছিল! রাজির বিয়ে হয়ে যাবে? এও সম্ভব! আমি এখন কী করব? ওকে ফোন করব? কিন্তু আমি যা করেছি তারপর...

আমি রাতে বাড়ি ফিরে আবার সামুদাকে ফোন করেছিলাম।

সামুদা ততক্ষণে মদ খেয়ে গলা জড়িয়ে ফেলেছিল। আমায় বলেছিল, "শোন, আমার আর এখন ভাট বকতে ভাল লাগছে না! তাও বলছি, আমি মিমিকে সারা জীবন ভালবাসলাম। ও নিজেও সারাটা সময় 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' বলে শেষে হঠাৎ বলল, আমায় নাকি ভালবাসেইনি কোনও দিন! আজও সেটা আমায় কোপায়! নিজেকে গান্ডু মনে হয়! মনে হয় কেউ আমার সবটা ঠকিয়ে নিয়ে নিয়েছে! আর সেখানে একটা মেয়ে তোকে ভালবেসেছে! সারা জীবন ধরে! আর আমায় জিজ্ঞেস করছিস কী করবি? তোকে শুধু বোকা বলব না, তাতারের দুটো অক্ষরও বলব?"

আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না। মাথার ভিতর কেমন করছিল। এত একা আর অসহায় কোনও দিন লাগেনি আমার নিজেকে। আমি নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকার গাছটার দিকে তাকিয়েছিলাম। ওই সেই গাছের আলন আর আলো-ছায়ার কারসাজিতে তৈরি অপেক্ষমাণ অবয়বটা আর দেখতে পাচ্ছিলাম না! এ কেমন করে সম্ভব! আমি দরজা খুলে প্যাটিওতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম! কিন্তু সেখান থেকেও তো দেখতে পাচ্ছিলাম না! তবে? সৈনিক কি বাজি শেষ হওয়ার আগেই উঠে চলে গেল এবারও!

আমি শরথের ঘরের দিকে তাকিয়েছিলাম। দরজা বন্ধ করে ও পড়ছিল। মনে হচ্ছিল এটা সত্যি ডালাস তো! দক্ষিণমেরুর কোনও নির্জনতম বিন্দু নয় তো!

মা! শুধু মা আছে আমার! মনে হয়েছিল মা এত কাছে রইল, তবু তাকেও তো কোনও দিনও সেভাবে দেখলাম না!

চারটে রিং হওয়ার পর মা ধরেছিল ফোনটা। অবাক গলায় বলেছিল, "কী রে হঠাৎ?"

আমি সময় নষ্ট করিনি। প্রায় চিৎকার করে বলেছিলাম, "তুমি রাজিদের বাড়িতে যাও মা। বলো, এই বিয়ে-ফিয়ে ও নেবে না করে!"

"তুই পাগল! আর আমি বলব কেন?" মার গলাটা কেমন নিষ্পৃহ শুনিয়েছিল।

"তো কে বলবে? ও তোমার কথা শোনে!"

"কিন্তু জেনেশুনে ওর জীবন নষ্ট করব কেন আমি?" মা বলেছিল, "ভাল ছেলে। রাজিকে খুব পছন্দ! একদিন তো রাজিকে ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করেও নিয়ে গিয়েছিল আকাশ! সেখানে কেন 'না' করব?"

আমি উত্তেজিত গলায় বলেছিলাম, "আরে, এটা বুঝতে পারছ না?"

মা সময় নিয়েছিল একটু, তারপর হালকা গলায় বলেছিল, "শোন, কেউ কিছু বোঝে না। অন্যকে বোঝা অত সহজ নয়। মেয়েটা তো বুঝত তুই ওকে পছন্দ করিস! কিন্তু কী বলেছিল মনে আছে? তোর কি মনে হয় আমাদের এই ছোট বাড়িটায় এক ঘরের কথা অন্য ঘর থেকে শোনা যায় না? কিন্তু কাজ নিজেকেই করতে হয়!"

"কিন্তু আমার তো এখানে কাজ আছে!" আমি বাচ্চাদের মতো পা দাপিয়ে চিৎকার করেছিলাম আবার।

মা বলেছিল, "তবে কর কাজ। আমরা কেউ তোকে বিরক্ত করেছি? শুধু জানিস পুঁথিগত শিক্ষাটাই সব নয়। মন দিয়ে পড়াশোনা কর। আমি রাখি!"

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। তাই আর কিছু ভাবনাচিন্তা না করে সোজা ফোন করেছিলাম রাজিকে। মনে হয়েছিল, ফোনটা তুললে ওকে আজ কথাই বলতে দেব না! গত এগারো বছরের জমে থাকা সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু আজই বলে দেব! কিন্তু বেজে-বেজে কেটে গিয়েছিল কলটা! রাজি ফোন ধরেনি! আমি বোবা মোবাইলটা হাতে ধরে ভেবেছিলাম, তা হলে এখন উপায়!

আমি সোমবার পরীক্ষা শেষ করেই ছুটেছিলাম আমাদের ফ্যাকাল্টি হেড প্রফেসর জোন্‌সের কাছে। ভদ্রলোক আমেরিকান। পঞ্চাশ বছর মতো বয়স! আমায় দেখে একটু অবাক হয়েছিলেন। পরীক্ষা চলছে তো, সেখানে কী দরকার পড়তে পারে আমার?

আমি কোনও ভণিতা না করে বলেছিলাম, "প্রফেসর, আমি ওই ছুটির ক্লাসগুলো নিতে পারব না!"

আমার উদভ্রান্তের মতো মুখ দেখে উনি কী বললেন বুঝতে পারছিলেন না। শুধু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কেন? ইট ওয়াজ্ স্যা ভ্যাল্ফ ফর ইউ!"

আমি বলেছিলাম, "বাড়িতে এমার্জেন্সি। প্লিজ্!"

আমার মুখ দেখে কী মনে হয়েছিল ওঁর কে জানে! শুধু বলেছিলেন, "আই উইশ যে জন্য তুমি এই সুযোগটা ছাড়ছ, সেটা যেন অন্তত সফল হয়!"

সাফল্য এক অদ্ভুত বস্তু! কিসের উপর যে নির্ভর করে কেউ জানে না! আমরা শুধু আমাদের অংশটুকু করতে পারি! বাকিটা গীতার সবচেয়ে ব্যবহৃত কোটেশন। আর এখানে আমি নিজেই তো নিজের বারোটা বাজিয়ে বেরিয়েছি!

পরীক্ষা শেষ হয়েছে ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ আর ফেরার টিকিট পেয়েছিলাম এগারো তারিখ রাতে। ছুটির সময় বলে দেরি হয়েছিল টিকিট পেতে! মানে কলকাতায় পৌঁছতে-পৌঁছতে তেরো তারিখ!

আমার হাতে টাকা ছিল না একদম। কিন্তু তাও টিকিটের টাকাটা সামুদার থেকে নিইনি আর! জানি না কেন। কিন্তু কোথায় যেন লাগছিল!

টাকাটা আমায় দিয়েছিল ইয়ানা! আমি একটা ছোট্ট কফিশপে বসে ওর কাছে আমার গোটা গল্পটা বলেছিলাম। বলতেই হয়েছিল!

সবটা শুনে ইয়ানা হেসেছিল খুব। তারপর বলেছিল, "আমি দিচ্ছি তোমায় টাকা। ডোন্ট ওরি! আর সত্যি তো কিছু টাকা ডিউ ছিল। বাকিটা অ্যাডভান্স হিসেবে দিলাম! সত্যি রিয়ান তুমি ইনকরিজিব্‌ল্!"

"কেন?" আমি অবাক হয়েছিলাম।

ইয়ানা বলেছিল, "জিজ্ঞেস করছ কেন? কাছে থাকতে বুঝলে না! আর দূরে এসে কখন বুঝলে? না, যখন ওর ওর বিয়ে ঠিক!"

আমি মাথা নামিয়ে নিয়েছিলাম।

ইয়ানা বলেছিল, "কিন্তু রাজিতা কেন অন্যের পছন্দে বিয়ে করছে? নাকি ছেলেটাকে ওরও পছন্দ!"

বেনিয়াটোলা লেনের মুখে গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে ছেড়ে দিলাম আমি। তারপর ঘড়ি দেখলাম। সময় আছে। মাথা তুলে তাকালাম আকাশের দিকে। সরু রাস্তার মাথার উপর ছাই রঙের আকাশ! ওই দূরে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে! দেখা যাচ্ছে দুই বাড়ির মধ্যের সাঁকোটাকে! রাজিতার দোয়েল-সাঁকোটাকে!

মায়ের মুখটা মনে পড়ল হঠাৎ। আমি এয়ারপোর্ট থেকে বাড়িতে ঢুকে শুধু ব্যাগটাই রেখেছি! বসিনি একটুও।

মা বলেছিল, "এমন পাগলামি করে কেউ! অত দূর থেকে এলি। আজ থাক। কাল যাবি!"

আমি বলেছিলাম, "আজ তেরো তারিখ না? ছেলের বাড়ির লোকরা তো সন্ধেবেলা আসবে। তুমিই তো বলেছিলে। আর সময় নেই মা!"

মা বলেছিল, "ওকে ফোন করিসনি?"

আমি বলেছিলাম, "গতকাল দুবাই থেকেও করেছিলাম। ধরেনি!"

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, "দেখ গিয়ে! সহজ জিনিসটাকে কী জটিল করলি ভাব! তুই এমন কেন বল তো?"

জানি না আমি কেমন! জানতে চাইও না। কী হবে জেনে? আমি শুধু মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, "আমার শেষ গ্যাস বেলুন মা! তুমি স্লিপ্ নেগেটিভ কিছু বোলো না!"

"দেখা হবে না। বাড়ি যা তুই," জেঠিমা দরজা আগলে দাঁড়িয়ে তাকাল আমার দিকে।

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। আমি তো কিছুই বলিনি। শুধু দরজার কড়া নেড়েছি! সেখানে জেঠিমা দরজা খুলেই এটা বলে কী করে?

আমি হাসার চেষ্টা করলাম, তারপর ঝুঁকে প্রণাম করতে গেলাম। জেঠিমা একটু রাগী, আমি জানি।

জেঠিমা সরে গেল সামান্য। কিন্তু দরজা থেকে হাত সরাল না। বলল, "ঢুকতে হবে না। দেখা হবে না মানে হবে না। তুই সরে যা।"

আমি বললাম, "আরে জেঠিমা, কেন এমন করছ? আমি কোথা থেকে এসেছি জানো?"

জেঠিমা একইরকম মুখ করে বলল, "চুলোর দোর থেকে এলেও যা, বিশেশ থেকে এলেও তাই! তুই চলে যা। আজ রাজির পাকা কথা আছে। সামনেই মল মাস। তাই আজই শেষ ভাল দিন। এটাকে আর নষ্ট করিস না। মেয়েটাকে তো শেষ করেইছিস! আর শত্রুতা করিস না। ওরা এল বলে।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। বললাম, "ওর জন্যই এসেছি আমি। সব কাজ ফেলে এসেছি জেঠিমা। স্লিপ্ একবার দেখা করতে দাও!"

"জানোয়ার!" আচমকা জেঠিমা খেপে গেল, "তুই যাবি, না তোর জেঠুকে ডাকব? যাবি?"

আমি দেখলাম গোলমালের শব্দ শুনে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে কাকিমা নেমে এসে।

আমি জেঠিমার দিকে না তাকিয়ে এবার কাকিমাকে বললাম, "প্লিজ্ কাকিমা! দেখো না জেঠিমা কেমন করছে! রাজিকে বলো আমি এসেছি! ও আমার ফোন ধরছে না!"

"তুই আমার সঙ্গে কথা বল!" জেঠিমা আরও রেগে গেল, "আমি যা বলি তাই এখানে হয়! আর রাজি কেন ধরবে তোর ফোন? কোন লাভসাহেব তুই? দূর হ, দূর হয়ে যা! যা!"

আমি আর কিছু বলার আগেই জেঠিমা শব্দ করে মুখের উপর বন্ধ করে দিল দরজাটা!

পুরনো, রংচটা দরজা! মাথার উপর নকশা করা। একসময় এই দরজাটা যখন-তখন পেরোতাম। কাউকে জিজ্ঞেস করতে হত না। কেউ বাধা দিত না। আর এখন! কাকিমাও তো দেখল আমায়! তাও ঢুকতে দিল না! তবে কি ওরা সত্যি চায় না আমি আসি! আমার জন্য কি সত্যি নষ্ট হবে রাজির জীবন? আমি এখন কী করব?

বেনিয়াটোলা লেন আরও সরু হয়ে এসে আমায় যেন চেপে ধরল! চোখ জ্বালা করে উঠল! কী জন্য আমি এলাম এখানে তবে? বাড়িতে ঢুকতে দিল না! রাজি ফোন ধরছে না! এবার তবে কী করব? আমি মাথা তুলে প্রায় অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের দিকে তাকালাম।

আকাশ! ওখানেই আছে না সেই আকাশগঙ্গা! যার দুই পারে চিরকাল বসে থাকে দুই ভালবাসার মানুষ! আর তাদের মেলাতে কে আসে? কারা দল বেঁধে? বছরের সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে কারা পৃথিবী থেকে উড়ে যায় মহাকাশে?

আমি দ্রুত এগোলাম। সরু রাস্তার ওপাশেও এমন একটা পুরনো দরজা আছে। এই দরজাটাতেও একইরকম নকশা করা। আমি জানি এই দরজাটা ভিতর থেকে শুধু ভেজানো থাকে। রাতের আগে বন্ধ করা হয় না। ছোটবেলায় রাজির সঙ্গে এখানে আসতাম! আমি দরজাটা ঠেলে সটান ঢুকে পড়লাম।

বাড়ির ভিতর একটা ছোট্ট উঠোন। পাশ দিয়ে উপরে ওঠার সিঁড়ি। আমি কোনও দিকে না তাকিয়ে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেলাম। একতলার ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ! দোতলারও তাই! প্রতিটা ফ্ল্যাটে ঢুকতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে আলাদা করে বেল বাজাতে হয়! তাই হয়তো মেন গেট খোলা থাকলেও সমস্যা হয় না!

কিন্তু তিনতলার মুখে একটা কোলাপসিবল গেট বসানো! আগে তো ছিল না! আমি গিয়ে অধৈর্য হাতে বেল বাজালাম!

"কে?"

আমি জানি গলাটা কার। বললাম, "আমি।"

"কে আমি? শাহরুখ খান নাকি?" ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কোলাপসিবল গেটের সামনে দাঁড়াল কুকি, "আরে রিয়ান!" কুকি যেন ভূত দেখল!

আমি বললাম, "দরজা খোলো তাড়াতাড়ি!"

"কেন?" কুকির এখনও ঘোর কেটেনি!

"আরে খোলো দরজা," আমি গেট ধরে ঝাঁকালাম জোরে!

কুকি দরজা খুলে দিতেই আমি ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

"কে রে?" ঠাকুরমার গলা পেলাম এবার।

আমি দ্রুত বারান্দায় গেলাম। ঠাকুরমা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঠাকুরমা হয়তো আরও কিছু বলত, কিন্তু আমায় দেখে ঠাকুরমাও চমকে গেল।

আমি সময় নষ্ট না করে ঠাকুরমার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঠাকুরমা তাকাল আমার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কী রে তুই? এখানে? কবে এলি?"

আমি হাঁপাতে-হাঁপাতে বললাম, "আজ বিকেলে ঠাকুরমা। আমি একটু ওইখানে যেতে পারি?"

"কোথায়?" ঠাকুরমা বুঝতে পারল না।

আমি সামনের ওই বাঁশের বেড়া দিয়ে আটকানো সাঁকোর মুখটা দেখালাম।

"কেন?" ঠাকুরমা অবাক হল।

আমি বললাম, "রাজির নাকি বিয়ে? ইয়ার্কি নাকি? বললেই হল! আমি যেতে গেলাম ওর কাছে। জেঠিমা আমায় যেতে দিল না। চন্দনও দিল না বাড়িতে!"

"কেন দেবে?" ঠাকুরমা শান্ত চোখে তাকাল আমার দিকে।

আমি বললাম, "আরে রাজির অন্যের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে শুনেছ নাকি? তোমরা কী বলছ সবাই?"

ঠাকুরমা এবার আর কিছু বলল না। তাকিয়ে রইল শুধু।

আমি বললাম, "আমি যাব রাজির কাছে। বিয়ে করবে মানে! দেখি, কে আমায় আটকায়!"

ঠাকুরমা বলল, "ওই সাঁকোটা তো মাঝে-মাঝে ভেঙে গেছে!"

আমি বললাম, "আরে, ওলায় লোহার দুটো মোটা রিম আছে!"

ঠাকুরমা বলল, "তুই এমন করছিস কেন? পড়ে গেলে?"

আমি বললাম, "উপায় নেই ঠাকুরমা। কোনও দিন তো কিছুই করলাম না। আর এই সাঁকোটা তো করাই হয়েছিল দুই বাড়ির মধ্যে যাতে যাতায়াত করা যায় সেইজন্য! তোমরা কেউ ইউজ করলে না। আমি একটু করি আজ। আমায় বড় কিছু তো একটা করতেই হবে! না হলে ও বিশ্বাস করবে কেন আমায়?"

আমি তাকালাম ওই বাড়ির দিকে। রাজির ঘরের আলো জ্বলছে! কিন্তু রাজিকে দেখা যাচ্ছে না! ও কি নেই তবে? আমি আরও একটু তাকিয়ে রইলাম। রাজি নেই ঘরে? নাকি... ওই তো!

আমি দেখতে পেলাম এবার। ঘরের ভিতর একটা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে রাজি। হাতে রুমাল। আরে, কী করছে ও? রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে কেন? আর কেন অমন হঠাৎ বিছানায় বসে মুখ গুঁজল বালিশে। কী হয়েছে রাজির?

আমি ঠাকুরমাকে বললাম, "আমি যাই।"

ঠাকুরমা হাসল। বলল, "যাই বলতে নেই। আয়।"

আমি এগোলাম।

সন্ধে নেমে এসেছে। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র, গ্রহ ও গ্রহাণুপুঞ্জ আর তাদের মধ্যে দিয়ে এক জীবন থেকে অন্য জীবন পার করে বয়ে চলেছে আকাশগঙ্গা! কে লঙ্ঘন করবে এই অর্বুদ নক্ষত্রমালা? অশ্রুকণার ডাকে কারা আসবে আজ পৃথিবীর সমস্ত ভালবাসা নিয়ে? সাঁকো কি আজ পৌঁছে দিতে পারবে দু'জনকে দু'জনের কাছে?

আমি ঠাকুরমার দিকে তাকালাম আর-একবার। তারপর বাঁশের বেড়া টপকে নামলাম ভাঙা সাঁকোটায়। আর পৃথিবীর সমস্ত দোয়েল পাখি মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে উঠে এল অসীম আকাশে! তারা একে অপরের ডানার সঙ্গে ডানা জুড়ে দিল প্রাণপণ! তৈরি করল সাঁকো! আমার থেকে আমার ভালবাসায় পৌঁছে যাওয়ার সাঁকো। তোমার থেকে তোমার ভালবাসায় পৌঁছে যাওয়ার সাঁকো! আমাদের সবার বুকের ভিতরের দোয়েল-সাঁকো!

ঠাকুরমার গল্প - ৩

জিকি জিজ্ঞেস করল, "তারপর? রাক্ষসরা তো রাজকন্যাকে সেই উঁচু মিনারে বন্দি করে রেখেছিল! তারপর কী হল?"

ঠাকুরমা বিছানায় বসে চাদরটা টেনে নিল গায়ে। তারপর বালিশে হেলান দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বাল অত অবধি বলেছিলাম?"

টুটি বলল, "হ্যাঁ তো! ওই যে রাক্ষসরা রাজকুমারীকে উঁচু মিনারে বন্দি করে রেখেছে! তারপর?"

ঠাকুরমা হাসল। বলল, "তারপর রাক্ষসরা তো শিকার করতে দূর-দূর দেশে চলে গেল! এমন সময় একজন ঘোড়সওয়ার জঙ্গলের ভিতর থেকে বর্শার মতো ছিটকে বেরিয়ে এল!"

টুপু জিজ্ঞেস করল, "ছিটকে বেরিয়ে এল?"

ঠাকুরমা বলল, "হ্যাঁ। একদম ছিটকে! সাদা ঘোড়ায় বসে সে এসে দাঁড়াল মিনারের তলায়! তারপর ঘোড়া থেকে নেমে তরোয়ালটা বের করল কোমরের খাপ থেকে!"

জিকি গোল-গোল চোখে জিজ্ঞেস করল, "ঘোড়সওয়ারটা কে গো? কী নাম ওর? কোথায় থাকে?"

"ও কে? কোথায় থাকে? কী নাম?" ঠাকুরমা ঝুঁকে পড়ে তিনজনের দিকে তাকাল। তারপর হুমহুমে গলায় বলল, "ও ডালাসিনগরের ছদ্মবেশী রাজপুত্র! ওর নাম রিয়ানকুমার!"

(দোয়েল-সাঁকো ছাড়া এই গল্পের আর সব কিছু বানানো।)

ঋণ: শ্রীপুনরজিৎ রায়চৌধুরী

অঙ্কন: অমিতাভ চন্দ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~